শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান
ইস্টার্ণ ল হাউস
১৫ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা
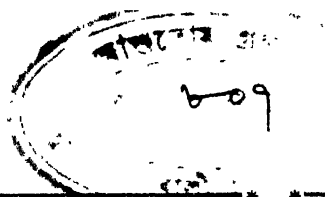
একদা বাঙালীর ছেলেরা দূর-দুর্গম পথে যাত্রা করিয়া, তাহাদের জাতির কীর্ত্তি ও গৌরবকে বহন করিয়া লইয়া যাইত।

সেই দুর্গম-পথে যাত্রার স্পৃহা বাঙালী ছেলের মন হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

আবার, বহু হারাইয়া-যাওয়া জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে, তাহা ফিরিয়া আসিতেছে।

শান্ত গৃহ-কোণ হইতে আজ বাঙালীর ছেলে দূর-দুর্গমতার দিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চাহিতেছে।

এই ছোট্ট বইখানি সেইরূপ একটী দীর্ঘশ্বাস।

প্রান্তরের তৃণের দীর্ঘশ্বাস, পর্ব্বত-শৃঙ্গের জন্য।

গ্রন্থকার

# সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

## ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাজিলান

( ১ )

যেদিন পৃথিবীতে মানুষ ছিল না, সেদিন পথ বলেও কিছু ছিল না।

পায়ে হেঁটে মানুষ পথ তৈরী করেছে।

শহরে ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু গ্রামে বা যে-সব যায়গায় পাহাড় বা বন-জঙ্গল আছে, সেখানে বেশ বোঝা যায়, কেমন করে, যেখানে কোন পথ ছিল না, সেখানে পায়ে-হাঁটার দাগে দাগে পথ তৈরী হয়ে উঠেছে।

যারা সেই পথে প্রথম পায়ের দাগ ফেলেছিল, হয়ত তাদের পায়ে পায়ে কাঁটা ফুটেছিল, হয়ত চলতে গিয়ে পথ ভুলে তাদের বিপথে ঘুরে মরতে হয়েছিল। তবু তাদেরই পথ-চলার ফলে, পায়ের পর পায়ের দাগ পড়তে পড়তে পথ তৈরী হয়ে উঠেছে।

এমনি ধারা যতখানি পথ মানুষ তৈরী করতে পেরেছে, ততখানি হল তার পৃথিবী। পথ যেখানে নেই, সেখানে মানুষেরও বাস নেই। পথ যেখানে শেষ, আমাদের জানা-পৃথিবীরও সেখানে শেষ।

পৃথিবীতে প্রথম-পা-ফেলার দিন থেকে মানুষ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত চেষ্টা করছে, নতুন নতুন পথ বার করে এই পৃথিবীর সীমানা বাড়াতে। পথ জানা ছিল না বলে একদিন য়ুরোপ আমেরিকাকে জানত না; পূর্ব্ব পশ্চিমকে চিনত না; প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের পৃথিবী ছিল আলাদা।

তাই সভ্যতার প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত, মানুষ, কি মাটীর ওপরে, কি সাগর-তরঙ্গের ভিতর দিয়ে, কি শূন্য বায়ু-পথে, অবিরাম নতুন পথের সন্ধানে ঘুরছে।

দুর্গম বলে কোন কিছুকে সে স্বীকার করে না।

তাই মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে, যুগে যুগে, দলে দলে তারা চলেছে, দূর দুর্গম পথে।

তারা বেরিয়েছে দলে দলে, এক জনের পর আর এক জন। পথের সন্ধানে হয়ত বেরিয়েছে হাজার জন, কিন্তু সন্ধান নিয়ে ফিরে এসেছে হয়ত একজন। বাকী ন'শো নিরানব্বুই জন লোককে পথ গ্রাস করে নিয়েছে। পথ থেকে ঘরে তারা আর ফিরে আসতে পারে নি।

এমনি ধারা যুগের পর যুগ চলেছে দুর্গম পথে মানুষের যাত্রী।

দুর্গম পথের যারা যাত্রী, তারাই করেছে পথকে সুগম।

( ২ )

সেই যে হাজারের মধ্যে ন'শো নিরানব্বুই জন, যারা পথ থেকে আর ফিরে আসতে পারে নি ঘরে, অথচ পথের সন্ধান দিয়ে গেল পৃথিবীকে, তাঁদেরই একজন হলেন, ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাজিলান। সমুদ্র-পথে তাঁরই দল সর্ব্বপ্রথম সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসে।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার শ' বছর আগেকার কথা। তখন য়ুরোপে স্পেন আর পর্ত্তুগালের প্রতাপ

সকলের চেয়ে বেশী। এই দুই দেশের দুঃসাহসী নাবিকেরা তখন সমুদ্রের ওপারে নতুন নতুন রাজ্যের সন্ধানে জীবন-মরণ তুচ্ছ করে নিত্য বেরুত। তাদের মতন দুঃসাহসী নাবিক য়ুরোপে তখন আর ছিল না। তাই সেদিন সমুদ্র-পথে ছিল স্পেন আর পর্ত্তুগালের একাধিপত্য।

এই দুই দেশের বন্দরে বন্দরে তখন অবিরত নৌকা আর জাহাজ তৈরি হচ্ছে। কাঠ-কাটা আর লোহা পেটানোর শব্দে বন্দরগুলো জম-জমাট হয়ে থাকত। প্রায়ই দেখা যেত, নতুন কোন নৌকা অজানা সাগরের পথে চলেছে নতুন তীরের সন্ধানে। দলে দলে লোক এসেছে তাদের বিদায়-অভিনন্দন জানাতে। এমনি অভিনন্দন নিয়ে এর আগে আরও অনেক দল গিয়েছে—তারা আর ফিরে আসে নি। ফিরে এসেছে শুধু সাগরের ঢেউএর মাথায় শাদা ফেনায় লেখা তাদের অতলে তলিয়ে যাবার সংবাদ। তবু বিরাম নেই নতুন অভিযানের, নতুন অভিনন্দনের। নতুন নৌকা জলে ভাসাতে তবু কেউ দ্বিধা করে নি; তাদের অভিনন্দন জানাতে তবু কারুর হাত কাঁপে নি। তীর ছেড়ে যারা চলে যেত, তাদের মুখে থাকত হাসি, বুকে থাকত উল্লাস; তীর আঁকড়ে যাদের

পড়ে থাকতে হ'ত তাদেরই মুখ হ'ত ম্লান, আশঙ্কায় নয়, নিজেদের অক্ষমতায়।

এই ছিল তখনকার স্পেন আর পর্ত্তুগালের রূপ। একটা জাতি যখন জেগে উঠতে থাকে, তখন এমনি হয় তার রূপ।

এ হেন সময়ে, সাব্রোসা বলে পর্ত্তুগালের এক গ্রামে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাজিলান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মাবার কুড়ি বছর আগেই কলম্বাস জন্মগ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, কলম্বাস যখন আমেরিকার মাটীতে পদার্পণ করেছেন, তখন ম্যাজিলানের বয়স মাত্র বারো।

ম্যাজিলান যখন বালক, তখন স্পেন আর পর্ত্তুগালের আকাশ এক অসাধ্যসাধনের স্বপ্নে ভরা। সমুদ্রের ওপারে আছে, নব নব দেশ, নব নব রাজ্য, মাঝখানে এই সমুদ্রের ব্যবধান দূর করতে হবে। দিকে দিকে তখন ভূগোলের চর্চ্চা; দিকে দিকে তখন নাবিকদের জয়গান। আমাদের দেশে কিছুকাল আগেও স্কুলের ভাল ছেলেরা স্কুলে পড়বার সময় যেমন স্বপ্ন দেখত যে, তারা ডেপুটী হবে, ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, তেমনি যে-সময়ের কথা আমরা বলছি, সে-সময় স্পেন আর পর্ত্তুগালের ছেলেরা একটু জ্ঞান হলেই মনে মনে কল্পনা করত যে, তারা মস্ত বড় সব

নাবিক হবে, সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন দেশে যাবার নতুন নতুন পথ তারা আবিষ্কার করবে।

ম্যাজিলান রীতিমত ভাল করে ভূগোল পড়লেন; তার পর নাবিকের কাজ শিখতে লাগলেন। একটু বয়স হতেই তিনি গ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে চলে এলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে সেখানে রাজসভায় একটা সামান্য চাকরী জোগাড় করে নিলেন। যখন দোম ম্যানোয়েল পর্ত্তুগালের রাজা হ'ন, তখন যুবক ম্যাজিলান স্বয়ং রাজার কাজে নিযুক্ত হলেন।

দোম্ ম্যানোয়েলের জীবনের একমাত্র বাসনা ছিল, পূর্ব্বজগতে পর্ত্তুগালের এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। ভারতবর্ষ জয় করবার জন্যে সমুদ্রপথে বহুবার তিনি অভিযান পাঠিয়েছেন। সেই সমস্ত অভিযানে যোগদান করবার জন্যে ম্যাজিলানের মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

অবশেষে একদিন সুযোগ এল। সেই সময় ফ্রান্‌সিস্‌কো দা'ল্‌মিদা নামে একজন নৌ-সেনাপতির অধীনে এক বিরাট নৌ-বাহিনী ভারতবর্ষের অভিমুখে পাঠান হয়। দা'লমিদার দলে সৈনিকরূপে যোগদান করবার অনুমতি ম্যাজিলান রাজার কাছ থেকে আদায় করলেন এবং ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই দলের সঙ্গে সমুদ্রপথে পূর্ব্ব-

জগতের দিকে যাত্রা করলেন। এই দা'লমিদাই ভারতবর্ষে পর্তুগীজ উপনিবেশের প্রথম ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি হন।

সাত বছর ম্যাজিলান সমুদ্র-পথে দা'লমিদার অধীনে কাজ করেন। এই দীর্ঘ সময়, বহু যুদ্ধে, বহু অভিযানে তিনি যোগদান করেন এবং তাঁর বীরত্ব ও সাহসে এই সময় থেকেই সকলের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে। অজানা তরঙ্গের মধ্যে মৃত্যুর সঙ্গে যুঝবার শক্তি ও সাহস এই সাত বছরেই তিনি অর্জ্জন করেন। এই সাত বছরের মধ্যে সমুদ্রপথে তিনি যে সব বীরত্ব এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা দিয়ে একখানা আলাদা বই লেখা যায়।

সামান্য সৈনিক থেকে ক্রমশঃ তাঁর পদোন্নতি হতে থাকে। অজানা সমুদ্রপথে এগিয়ে পথ খুঁজে বার করবার জন্যে তাঁকেই প্রায় পাঠান হ'ত। এই সমস্ত দুঃসাহসিক অভিযানে তাঁর এক বন্ধু ছিল, নাম ফ্রান্সিস্কো সেরাও, দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। মৃত্যুর অভিসারে তাঁরা দুজনে প্রায়ই বেরুতেন একসঙ্গে। একবার দুর্ভাগ্যক্রমে মুর-নাবিকদের চক্রান্তের ফলে সেরাও এবং ম্যাজিলান সমুদ্রপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। সেরাও

মুরদের হাতে গিয়ে পড়েন। মুরদের সঙ্গে তখন স্পেনীয়দের ঘোরতর শত্রুতা চলেছে। তাঁর নৌকো তারা ডুবিয়ে দেয়। বহু কষ্টে তিনি সুদূর মলক্কাস দ্বীপে গিয়ে উঠলেন এবং সেইখানেই আটক রয়ে গেলেন। মলক্কাস দ্বীপ থেকে তিনি আর য়ুরোপে ফিরে আসতে পারেন নি।

চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যেও কেমন করে সৌভাগ্যের বীজ লুকিয়ে থাকে, এই ঘটনা তার একটা মস্ত বড় বড় উদাহরণ। সমগ্র য়ুরোপ তখন এই মলক্কাস্ দ্বীপপুঞ্জ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সমুদ্র-পথে কেমনভাবে সেই দ্বীপে পৌঁছান যায়, তখন য়ুরোপে কেউ জানত না। তখন এই দ্বীপপুঞ্জ ছিল য়ুরোপের নাবিকদের কাম্য-ভূমি, কেন তা একটু পরেই তোমাদের বলছি।

ওধারে ম্যাজিলান বন্ধুকে সমুদ্রপথে বহু অনুসন্ধান করেও যখন পেলেন না, তখন তাঁর স্থির বিশ্বাস হ'ল যে সেরাও নিশ্চয়ই মুরদের হাতে পড়ে মারা গিয়েছেন। সেই ঘটনার পর ম্যাজিলান পর্ত্তুগালে ফিরে এলেন।

এমনি ধারা অনেক দিন যায়। একদিন হঠাৎ এক অজানা লোক তাঁকে অনুসন্ধান করে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠি খুলে দেখেন, সেরাও-এর লেখা। বহু

সমুদ্র ঘুরে সেই চিঠি সৌভাগ্যক্রমে তাঁর কাছে পৌঁছয়। সেই চিঠিতে সেরাও মলাক্কাস্ দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়েছিলেন। মলাক্কাস্ দ্বীপপুঞ্জের ঐশ্বর্য্যের কথা তখন য়ূরোপে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। সেরাও সেই কথাই সমর্থন করে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে সেরাও বন্ধুকে জানিয়েছিলেন যে, যদি পর্ত্তুগাল এই দ্বীপ তার সাম্রাজ্যভুক্ত করতে পারে, তা হলে তার ধন-সম্পদের সীমা থাকবে না। সেরাও আর ম্যাজিলানের দেখা-শোনা জীবনে আর হয় নি, কিন্তু সেই চিঠি ম্যাজিলানের জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিল।

( ৩ )

ম্যাজিলানের জীবন সম্বন্ধে বল্‌বার আগে, এখানে দুটো জিনিষের একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

প্রথম হ'ল, পূর্ব্বদেশে আসবার পথ তো ম্যাজিলানের আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। তা হলে ম্যাজিলানের এত ভাবনা কেন? পূর্ব্বে আসবার স্থল-পথ জানা থাকতেও কেন সেই সময় লোকে অজানা তরঙ্গের মধ্যে জীবন বিপন্ন করে সমুদ্রের মধ্যে পথ

খুঁজছিল? দ্বিতীয় হ'ল, মলক্কাস দ্বীপ-পুঞ্জ সম্বন্ধে য়ুরোপের এত আগ্রহ কেন?

স্থল-পথে সে-সময় য়ুরোপীয় জাতিদের পক্ষে পূর্ব্ব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল; কারণ মুর এবং তুর্কীদের তখন স্থলে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তাদের সঙ্গে ছিল য়ুরোপীয়দের ঘোরতর শত্রুতা। সেই জন্যে তাদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে য়ুরোপ থেকে পূর্ব্ব-দেশে স্থলপথে যাওয়া-আসা বা বাণিজ্য করাতে য়ুরোপের বিশেষ অসুবিধা ছিল; এবং সেই জন্যই য়ুরোপের লোকেরা পূর্ব্বদেশে পৌঁছবার পথ সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে খুঁজতে বাধ্য হয়।

আগে য়ুরোপের নাবিকদের ধারণা ছিল যে, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ঘুরে অন্য কোথাও যাওয়া যায় না; এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের শেষ সীমান্ত সম্বন্ধে তাঁদের নানা রকমের অদ্ভুত ধারণা ছিল। সাধারণতঃ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সেখানে সূর্য্যের তাপ এত বেশী যে গেলেই পুড়ে যেতে হবে। সেখানকার সমুদ্রে সর্ব্বদাই এমন ঝড় হয় যে, কোন নৌকো সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না। সেই ভয়াবহ সাগরে রহস্যময় সব দানব থাকে, এই ধরণের বিশ্বাস সেকালের য়ুরোপের

নাবিকদের মনে ছিল। সেই জন্যে আফ্রিকার উত্তর কূল এবং পশ্চিম কূলের খানিকটার সঙ্গে পরিচিত হয়েই তারা সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রিন্স হেন্‌রীর উৎসাহ এবং চেষ্টায় পর্ত্তুগালের নাবিকেরা ক্রমশঃ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে একটু একটু করে অগ্রসর হতে লাগলেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বারথলোমিউ ডিয়াজ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের শেষ সীমান্ত পার হয়ে, এসিয়া যাবার পথে ভারত সাগরে এসে পড়লেন। একটা প্রবল ঝড়ে তাঁর নৌকাকে দিশেহারা করে আফ্রিকার পশ্চিম উপকুল পার করিয়ে ভারত-সমুদ্রে নিয়ে ফেলে। তিনি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল শেষ করে পূর্ব্ব উপকূলে এসে পড়েছেন, সে কথা তিনি তখন বুঝতে পারেন নি! নাবিকদের অনু-রোধে তিনি ভারত সমুদ্রে বেশী দূর অগ্রসর না হয়ে ফিরতে বাধ্য হন। যাবার সময় ঝড়ে তিনি যা বুঝতে পারেন নি—ফেরবার পথে তিনি তা বুঝতে পারলেন। আফ্রিকার শেষ সীমান্তের মাটীতে নেমে তিনি পর্ত্তুগালের হয়ে পাথর পুঁতলেন, এবং সেই অন্তরীপের নাম দিলেন, ঝটিকা অন্তরীপ, Cape of Storms.

পর্ত্তুগালে ফিরে আসার পর তাঁর আবিষ্কারের কথা শুনে পর্ত্তুগালের রাজা বললেন, সেই অন্তরীপ ঝটিকা অন্তরীপ,

Cape of Storms নয়, তার নাম দেওয়া হ'ক উত্তমাশা অন্তরীপ, Cape of Good Hopes. এতদিন যে-পথের অন্বেষণ চলছিল, তার সন্ধানের আশা এবার সম্ভব হ'ল! সেই থেকে তার নাম আজও Cape of Good Hopes.

সেই আশা সম্ভব করে তুললেন, কলম্বাস আর ভাস্কো ডা গামা। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে ম্যাজিলানের বিশেষত্ব কি? ম্যাজিলানের আগে য়ুরোপীয় নাবিকেরা পূর্ব্ব দিক্ ধরে যাত্রা করে ভারতবর্ষ এবং আমেরিকায় পদার্পণ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে ভারত-সমুদ্রে আসেন। সেখান থেকে কলম্বাস ভারতবর্ষের সন্ধানে অষ্ট্রেলিয়া ঘুরে উত্তর-আমেরিকায় এসে পৌছান এবং ভাস্কো ডা গামা ভারতসাগর উত্তীর্ণ হয়ে ভারতবর্ষে পৌছন। কিন্তু, সেই সময় কোন কোন নাবিকের ধারণা হয় যে, আফ্রিকা ঘুরে না গিয়েও পশ্চিম দিক্ দিয়ে পূর্ব্ব জগতে ঢোকবার আর একটা পথ আছে। কিন্তু সে ধারণাকে তখনকার নাবিকেরা পাগলামী মনে করত। তাঁদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কলম্বাস যেন তুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন, তা পূর্ব্ব আর পশ্চিম জগতের মধ্যে যাতায়াতের পথকে

বন্ধ করে এক মেরু থেকে আর এক মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। ম্যাজিলান এই ভুল দূর ক'রেন।

পশ্চিম দিক দিয়ে যাত্রা করে তিনি পূর্ব্ব জগতে আসবার পথ বার করেন এবং এই ভাবে তাঁর সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসার ফলে জগতে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর যেখান দিয়েই যাত্রা কর, যদি বাধাহীন-ভাবে পরিভ্রমণ করে চ'লে যাওয়া যেতে পারে, তা' হলে আবার ঠিক সেই যায়গাতেই ফিরে আসবে। সেই জন্যই সমুদ্রপথ-আবিষ্কারের ইতিহাসে ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাজিলানের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

( ৪ )

এবার মলাক্কাস্ দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিয়ে আবার আমরা ম্যাজিলানের জীবন-কাহিনীতে ফিরে যাব। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে এবং ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে এই দ্বীপপুঞ্জ ইণ্ডিয়ান্ আর্কিপেলেগোর অন্তর্ভুক্ত। •এই দ্বীপ-পুঞ্জের আর একটি নাম হ'ল **Islands of Speices,** অর্থাৎ লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ ইত্যাদি যে-সব মশলা আমরা ব্যবহার করি, তা এই দ্বীপ-পুঞ্জ থেকেই জগতে সরবরাহ

হয়। এই সমস্ত সামান্য মশলা, যা আমরা অনায়াসেই আজ যে-কোন বাজারে পাই, সেই সময় য়ুরোপে দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য ছিল। সেই জন্যে এই দ্বীপ অধিকার করবার উদ্দেশ্যে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর য়ুরোপে জাতিতে জাতিতে প্রবল ঝগড়া চলতে থাকে। আমরা যে-সময়ের কথা বলছি, তখন য়ুরোপে এই দ্বীপপুঞ্জের অধিকার নিয়ে স্পেন আর পর্ত্তুগালের মধ্যে প্রবল ঝগড়া চলছিল। খৃষ্টান-জগতে তখন পোপের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি মধ্যস্থ হয়ে স্পেন আর পর্ত্তুগালের সামুদ্রিক অধিকারের একটা ব্যবস্থা করে দেন। উত্তর-মেরু থেকে দক্ষিণ-মেরু পর্য্যন্ত একটা কাল্পনিক রেখা টেনে তিনি ঠিক করে দেন যে, আজোরাসের ৩৭০ লীগ পশ্চিম পর্য্যন্ত যত নতুন দেশ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা স্পেনের, আর তার পূর্ব্বদিকের সমস্ত নতুন দেশ পর্ত্তুগালের। তার ফলে আমেরিকা পড়ল স্পেনের অধিকারে। কিন্তু ম্যাজিলান বললেন, যদি সেই বিধান মানতে হয়, তা হলে মলাক্কাস দ্বীপপুঞ্জ পড়ে স্পেনের অধিকারে। তিনি তা প্রমাণ করে দিতে পারেন। এবারে ফিরে আসা যাক্ ম্যাজিলানের জীবনীতে।

( ৫ )

তরঙ্গ-বিতাড়িত হয়ে ম্যাজিলান পর্ত্তুগালে ফিরে এলেন। তখন থেকেই তাঁর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, পশ্চিম দিক দিয়ে পূর্ব্ব-জগতে পৌছবার নিশ্চয়ই কোন পথ আছে। সেই পথ খুঁজে বার করতে হবে। এই সময় মুরদের সঙ্গে পর্ত্তুগালের আবার ঘোরতর সংগ্রাম বাধে। রাজা দোম ম্যানোয়েল সেই যুদ্ধে ম্যাজিলানকে পাঠালেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই যুদ্ধে কতকগুলি উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে তাঁর তীব্র মনোমালিন্য হয়। তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করে ম্যাজিলানের বিরুদ্ধে নানা কল্পিত অভিযোগ রাজার কাছে পাঠাতে লাগল। ম্যাজিলান এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপার কিছুই জানতেন না। তিনি যখন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পর্ত্তুগালে ফিরলেন, তখন রাজা দোম ম্যানোয়েল তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করলেন। কোন রকমে সেই সব অভিযোগের হাত থেকে তিনি নিজকে রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু রাজার বিরূপতা ঘোচাতে পারলেন না।

সুস্থ হয়ে উঠে তিনি রাজার কাছে তাঁর অন্তরের বাসনা জানালেন, যদি রাজা তাঁকে লোকজন এবং নৌকো দিয়ে সাহায্য করেন, তা হলে মলাক্কাস দ্বীপে পৌছবার

নতুন পথ তিনি আবিষ্কার করে দিতে পারেন। কিন্তু দোম্ ম্যানোয়েল তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। ম্যাজিলান দ্বিতীয়বার আবেদন করলেন, কিন্তু দোম্ ম্যানোয়েল তাঁর কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত করলেন না। অনাদর এবং অবজ্ঞায় সংক্ষুব্ধ হয়ে ম্যাজিলান স্বদেশ এবং স্বদেশের রাজাকে ত্যাগ করে স্পেনের রাজ-দরবারে এলেন। তিনি জন্মের মত পর্ত্তুগালের মাটী ত্যাগ করে স্পেনের অধিবাসী রূপে বসবাস স্থাপন করলেন।

স্পেনের রাজা তখন পঞ্চম চার্লস। তিনি পঞ্চম চার্লসকে জানালেন যে. পোপ যে-ভাবে স্পেন আর পর্ত্তুগালের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে দিয়েছেন, তাতে মলাক্কাস্ দ্বীপও স্পেনের অধিকারে পড়ে। তিনি সমুদ্র-অভিযান দ্বারা তার কথার সত্যতা প্রমাণ করে দিতে পারেন।

যখন দোম্ ম্যানোয়েলের কানে সেই সব কথা গেল, তিনি ম্যাজিলানের উপর রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন। ম্যাজিলানের সেই সম্ভাব্য অভিযানকে কেন্দ্র করে স্পেন আর পর্ত্তুগালের মধ্যে প্রবল বিদ্বেষ তীব্রভাবে জেগে উঠল। ম্যাজিলানের যে সব আত্মীয় পর্ত্তুগালে ছিল, অবশেষে রাজরোষ গিয়ে পড়ল তাদের উপর। অপমানে

এবং অত্যাচারে সংক্ষুব্ধ হয়ে তারা পর্ত্তুগাল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন। স্পেনে থেকেও ম্যাজিলান নিজে নিরাপদ্ ছিলেন না। তাকে হত্যা করবার জন্যে গুপ্তচর নিযুক্ত হয় এবং সমুদ্র-পথে যাতে ম্যাজিলানের অভিযান বেশীদূর অগ্রসর হতে না পারে, অভিযানের আগে থেকেই তার আয়োজন চলতে থাকে।

কিন্তু ম্যাজিলান কিছুতেই বিরত হলেন না। অসম্ভবের আহ্বান-ধ্বনি একবার যার রক্তে জেগে ওঠে, কোন কিছু আর তাকে ধরে রাখতে পারে না। রুদ্র যাদের ডাকেন, তাদের এমনি করেই ডাকেন। স্পেনেও তিনি খুব শান্তিতে ছিলেন না। স্পেনের রাজ-সভার সভ্যরা ম্যাজিলানের প্রস্তাব শুনে তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। তাদের ধারণায় ম্যাজিলান যে পয়ঃপ্রণালীর অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন, তা স্বপ্ন-রাজ্যেই সম্ভব। পঞ্চম চার্লসও ম্যাজিলানের প্রস্তাবকে বিশ্বাস্য বলে গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তবুও ম্যাজিলান তাঁর অন্তরের বিশ্বাস হারান নি। তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পেতেন যে, পশ্চিম দিক্ দিয়ে পূর্ব্ব-জগতে প্রবেশ করবার জন্যে সেই নব-আবিষ্কৃত মহাদেশের মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই কোন্ পয়ঃপ্রণালী আছে। বার বার অনুরোধের ফলে পঞ্চম

চার্লস ম্যাজিলানকে তাঁর প্রস্তাবিত অভিযানে সাহায্য করতে সম্মত হলেন। অথবা বলা যেতে পারে যে, দরিদ্র ব্যক্তির বার বার সকাতর অনুরোধে উত্ত্যক্ত হয়ে ধনী যেমন সেই ব্যক্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাম্রখণ্ড ছুঁড়ে দেয়, তেমনিভাবে পঞ্চম চার্ল্স্ ম্যাজিলানের সেই দুস্তর অভিযানের জন্যে পাঁচখানি অতি পুরাণো এবং জীর্ণ নৌকা দিলেন। সেই নৌকা গুলো দেখে স্পেন-দেশেরই একজন নাবিক বলেছিল, "I would be sorry to sail even to Canaries in them; for their ribs are as soft as butter"—অর্থাৎ—"সেই নৌকায় চড়ে আমি ক্যানারী দ্বীপ-পুঞ্জ পর্য্যন্ত যেতেও রাজী নই, তার কারণ নৌকার পাঁজরার কাঠগুলো মাখমের মত নরম হয়ে গিয়েছে!" সেই পাঁচখানি জীর্ণ নৌকা কোথায় ধূলোয় মিশিয়ে যেত, কিন্তু ভাগ্য-ক্রমে তাদের নাম ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে গেল, আণ্টনীও, ত্রিনিদাদ, কন্‌সেপ্‌সিওন, ভিক্টোরিয়া এবং সাণ্টিয়াগো। ম্যাজিলান তাঁর নিজের জন্যে ত্রিনিদাদ নৌকাটি নিলেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সেই পাঁচখানি জীর্ণ নৌকা নিয়ে ম্যাজিলান সেভিল্ বন্দর থেকে সপ্ত-সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে যাত্রা করলেন।

( ৫ )

ম্যাজিলানের সঙ্গে যারা এই দুর্গম পথে যাত্রা করেছিল, তাদের মধ্যে নানা রকমের লোক ছিল। বিচিত্র তাদের ধারণা, বিচিত্র তাদের চরিত্র! একদল লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই অভিযানের কোন একজন নায়কের সঙ্গে ভূত-প্রেতদের রীতিমত যোগাযোগ আছে। একজন নায়ক ছিলেন, যিনি শুধু আকাশের তারার গতিবিধি লক্ষ্য করতেন, কারণ আকাশের তারা দেখে জাহাজের ভবিষ্যৎ ভাগ্য বলে দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা না কি তাঁর ছিল। ম্যাজিলানের সঙ্গে সেদিন যে ২৮০ জন লোক সমুদ্র-পথে জগৎ-পরিভ্রমণে বেরিয়েছিল, তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই সন্দেহ ছিল যে, হয়ত সমুদ্রের মাঝখানে কোথাও জলপরীদের মায়াজালে কিংবা জল-দানবদের আক্রমণে তাদের সকলকেই বিপর্য্যস্ত হ'তে হবে।

সব চেয়ে মজা হয়, যেদিন তারা প্রথম "শীল" মাছ দেখতে পেলো। এর আগে তারা কেউ এ জন্তু দেখে নি, সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যে তার অস্তিত্বও কল্পনা করতে পারে নি। অনেকেই মনে করল যে, এতদিন মনে মনে তারা যে আশঙ্কা করে এসেছিল, এইবার বুঝি তাই সত্যি ঘটে! অনেক গবেষণার পর তারা ঠিক করল

—জল-পরী বা জল-দানবের সঙ্গে এই জন্তুর কোন সম্পর্ক নেই—এ নিশ্চয়ই সমুদ্রের "নেক্‌ড়ে-বাঘ" !

কিন্তু ম্যাজিলান জানতেন যে, তাঁর দলের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল, যাদের মনে এই সব ধারণার চেয়ে ঢের বেশী ভয়ঙ্কর সব ভাবনা নিশিদিন সজাগ হয়ে ছিল। দিনের বেলা তাঁর জাহাজ স্পেনের পতাকা উড়িয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে চলত; আর চারখানি জাহাজ সেই পথ অনুসরণ করে চলতো। রাত্রি-বেলায় তাঁর জাহাজের মাস্তুলে একটা বড় লাল আলো জ্বালা হত। অন্ধকারে সেই লাল আলো লক্ষ্য করে পেছনের চারখানি জাহাজ পথের সন্ধান পেত।

যেদিন স্পেনের পতাকা উড়িয়ে পর্ত্তুগীজ ম্যাজিলান সমুদ্রপথে বেরিয়েছিলেন, সেদিন পর্ত্তুগাল ম্যাজিলানের ব্যবহারে রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সেদিন থেকেই সমুদ্র-পথে তাঁকে বিপন্ন করবার জন্য ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। রাত্রিবেলা তাঁর জাহাজের সঙ্গে পেছনের চারখানা জাহাজের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবার জন্যে পর্ত্তুগালের রাজা লোক এবং জাহাজ নিযুক্ত করেছিলেন। ম্যাজিলানের শ্বশুর সেই সংবাদ পেয়ে ম্যাজিলানের জাহাজ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই একখানা নৌকাতে এই সংবাদ তাঁর কাছে

পাঠিয়ে দেন। এই সংবাদ পেয়ে ম্যাজিলান বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না; শুধু তাঁর নির্দ্ধারিত পথ ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম দিক্ ঘেঁসে এগিয়ে চলতে লাগলেন। এইভাবে পর্ত্তুগালের রাজরোষকে তিনি অনায়াসে এড়িয়ে গেলেন।

কিন্তু এর চেয়েও বড় বিপদ্ তাঁর সহচর হয়ে ছিল। তাঁর সঙ্গে যে ২৮০ জন স্পেনিয়ার্ড এসেছিল, তারা সকলেই যাত্রার সময় নতজানু হয়ে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করেছিল বটে, কিন্তু তাদের কারুর কারুর মনে ঘোরতর দুরভিসন্ধি ছিল। তারা যখনই ভাবত যে, একজন পর্ত্তু-গালের লোক এসে তাদের ওপর নেতৃত্ব করছে, তখনি তাদের মন হিংসায় জ্বলে উঠত। তারা ঠিক করেছিল, মাঝ-সমুদ্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ম্যাজিলানকে আক্রমণ করবে। তার পরে, তিনি নেতৃত্বের ভার দিয়েছিলেন জুয়ান ডি কার্থাজিনার ওপর এবং সকলের চেয়ে বিপদের বিষয় ছিল যে, কার্থাজিনাই ছিল সেই বিদ্রোহীদের নেতা এবং সব চেয়ে বড় যে জাহাজখানা ছিল সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল সে। এ হেন অবস্থায় ম্যাজিলান সমুদ্রপথে ভূ-প্রদক্ষিণ করতে বেড়িয়েছিলেন!

ম্যাজিলান কার্থাজিনার মনোভাব বুঝতে পেরে-ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রতিদিনই সে

বিদ্রোহ ঘোষণা করবার নানা রকমের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়। ম্যাজিলানের যেমন ছিল সাহস, তেমনি ছিল বুদ্ধি। তাঁর মনের ভাব কাউকে না প্রকাশ করে, একদিন নিজের জাহাজে তিনি কার্থাজিনাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। কোন রকম সন্দেহ না করে কার্থাজিনা তাঁর জাহাজে এল। তিনি লোকজন সব ঠিক করে রেখেছিলেন। কার্থাজিনা আসতেই তাকে বন্দী করবার হুকুম দিলেন।

কার্থাজিনাকে বন্দী করে, ম্যাজিলান তৎক্ষণাৎ কঠোর হস্তে সেই বিদ্রোহ দমন করলেন। কার্থাজিনার যায়গায় তাঁর ভাই-পো আলভেরো ডি মেস্‌ব্যুইটাকে তিনি সেই অভিযানের দ্বিতীয় কর্ত্তৃত্বের ভার দিলেন। অবশ্য, কিছুকাল পরেই কার্থাজিনাকে আবার তিনি মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

[ ৬ ]

ইতিমধ্যে তাঁরা দক্ষিণ-আমেরিকার তীরভূমির কাছে এসে পড়লেন। ১৩ই ডিসেম্বর একটা বন্দরে নঙ্গর ফেলা হ'ল, সে বন্দরটির নাম তাঁরা দিলেন, 'সাণ্টা লুসিয়া'। বাধ্য হয়ে সেখানে তাঁরা প্রায় পনেরো দিন অপেক্ষা

করলেন। জিনিষ-পত্র বদলা-বদলি করে সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে তাঁরা খাবার জিনিস সংগ্রহ করতে লাগলেন। সেখানকার আদিম-অধিবাসীরা তাঁদের জিনিস-পত্র দেখে তো বিস্ময়ে অবাক্! সামান্য একটা ঘণ্টা, তাই নেবার জন্য তাদের মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একটা ঘণ্টার বদলে তারা একটা বড় ষাঁড় দিয়ে দিল; তাসের একখানা ছবির জন্যে, ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার, গৃহ-পালিত সমস্ত জীব-জন্তু পরমানন্দে বদল করলো। একখানা ছুরির জন্যে তারা তাদের ছেলে-মেয়ে পর্য্যন্ত বদলি করতে রাজী ছিল।

এইভাবে নতুন রসদ সংগ্রহ করে ম্যাজিলান দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিছুদিন চলার পর, বর্ত্তমানে যে অন্তরীপকে আমরা 'রিয়ো ডি লা প্লাটা' (Rio de la Plata) বলে জানি, সেইখানে তাঁদের জাহাজ এসে আবার নঙ্গর ফেললো।

ম্যাজিলানের অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দক্ষিণ আমেরিকার গা দিয়ে নিশ্চয়ই একটা পয়ঃপ্রণালী আতলান্তিক মহাসমুদ্রের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের যোগ-সাধন করিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ যার মধ্য দিয়ে গিয়ে

আতলান্তিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে পড়া যায়।

যখন তিনি 'রিয়ো ডি লা প্লাটা' অন্তরীপে এসে পৌঁছলেন, তখন তার মুখে এক পয়ঃপ্রণালী সাগরে এসে পড়েছে দেখে, তাঁর আশা হল যে, হয়ত দক্ষিণ আমেরিকার গা দিয়ে যে পয়ঃপ্রণালী অপর মহাসমুদ্রে গিয়ে পড়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন, এইটেই সেই। এই ভেবে তিনি সেই জল-প্রবাহ ধরে ভেতরে গিয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অনুমান ভুল হয়েছে।

এই সময় ভয়াবহ ঝড় আর ঠাণ্ডা হাওয়া তাঁদের জাহাজের পিছু নিল। দেখতে দেখতে নিদারুণ শীত নেমে এল। সেই দুর্দ্দৈবের আঘাতে তাঁর দলের কয়েকজন লোক মারাও গেল। খাবারও খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসছিল। ঝড় এত ভয়াবহ আর তীব্র হয়ে এল যে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। তখন তিনি সেণ্ট জুলিয়ান উপসাগরের মুখে, আজকাল যেখানে পোর্ট সেণ্ট জুলিয়ান আছে, সেখানে নঙ্গর ফেললেন। স্থির হলো যে, শীতকালটা সেইখানে থেকে যাবেন এবং এই সময়টুকু নতুন করে আবার খাদ্য সংগ্রহ করবেন।

( ৮ )

ম্যাজিলান যখন সেই নূতন সাগরে এসে পড়েন, তখন তার শান্ত মূর্ত্তি দেখে তিনি বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই তার নাম তিনিই দিয়েছিলেন প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean) ! তার আগে সেই অগাধ জলরাশির কোন নামই ছিল না।

কয়েকদিন পরেই ম্যাজিলান বুঝতে পারলেন যে, জগতের পরিধি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান তাঁকে প্রতারিত করেছে। নাবিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, কোথাও তীরের চিহ্ন মাত্র নাই। চারিদিকে অসীম অগাধ বিস্তৃত তরলতা, ইংরাজ কবির ভাষায় যাকে বলে, "burning desert of water." সঙ্গে যা খাদ্য ছিল, সমস্তই ফুরিয়ে গেল। জল নেই, হয় সমুদ্রের সেই লোনা জল খেতে হবে, না হয় পরিত্যক্ত নর্দ্দমায় যে সব ময়লা জল পড়ে ছিল, তাই খেতে হবে। ক্ষিপ্ত নাবিকের দল তৃষ্ণার অধীর হয়ে সে-ই জলই খেতে লাগল; খাদ্য নেই, জাহাজের ইঁদুর মেরে খেতে আরম্ভ করল। তাও গেল ফুরিয়ে, তখন জাহাজের গা থেকে চামড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে খেতে লাগল। দলে দলে লোক প্রাণ দিতে

লাগল! সকলেরই ক্ষিপ্ত অবস্থা। তার মধ্যে ম্যাজিলানের চিত্তে তখনও অনির্ব্বাণ আশার শিখা জ্বলছে। সেই অসীম অনিশ্চয়তার মধ্যে সেই সহায় সম্পর্কহীন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যে, তখনও তিনি পথ নির্দ্দেশ করে চলেছেন: তখনও তিনি আকাশের দিকে চেয়ে, সমুদ্র-তরঙ্গের প্রতিধ্বনির সঙ্গে নেতার কণ্ঠে আশার বাণী জাগিয়ে তুলেছেন।

এইভাবে নব্বুই দিন যাবার পর তারা মাটীর দেখা পেলেন। যাঁরা জাহাজে অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই তখন মুমূর্ষ অবস্থা। প্রথম যে-দ্বীপে তাঁরা নামলেন, সেখানে আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে জিনিষপত্র-বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। খাদ্য আসতে আসতেই অনেকের প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হয়ে গেল। এ হেন অবস্থায় ম্যাজিলান দেখলেন যে, সে দ্বীপে বেশী দিন থাকা নিরাপদ নয়; কারণ, দেখা গেল, সেখানকার লোকেরা রীতিমত ডাকাত। তাঁদের জাহাজ থেকে দরকারী জিনিষপত্র সব চুরি হয়ে যেতে লাগল। সেই দ্বীপ ছেড়ে তিনি আবার সমুদ্রে ভাসলেন, যাবার সময় দ্বীপের নাম রেখে গেলেন, 'ডাকাতের দ্বীপ'—Island of Robbers—(Ladrones).

ল্যাড্রোনিস্ দ্বীপ থেকে ন'শো মাইল আসার পর ম্যাজিলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের দেখা পেলেন। এইখানে এসে তিনি মুমূর্ষ লোকদের জন্যে মাছ, মাংস, ফল ইত্যাদি খাদ্য পেলেন এবং উপযুক্ত নেতার মত সর্ব্ব-প্রথম সেই দ্বীপে নেমে অসুস্থ মুমূর্ষ লোকদের সেবার ব্যবস্থা করলেন। নিজ-হাতে সেবা করে তিনি তাদের সকলকে আবার সুস্থ করে তুললেন।

এই সময়ে ম্যাজিলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দলপতি এবং রাজাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি যে-পথ দিয়েই যান, সেখানকার দলপতির সঙ্গে আলাপ করেন—তারাও সকলে ম্যাজিলানের দলের লোকদের অস্ত্রশস্ত্র দেখে সসম্ভ্রমে তার সঙ্গে ব্যবহার করে। ম্যাজিলান তখন বুঝেছিলেন যে তিনি জয়ী। আর কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মলাক্কাস্ দ্বীপে গিয়ে পৌঁছবেন। জয়ের উল্লাস তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। তিনি যে-দ্বীপে যেতেন, সেখানকার রাজার কাছেই তাঁর শক্তি দেখাবার জন্যে বলতেন, যে-দেশ থেকে তিনি আসছেন সে-দেশের শক্তির তুলনা নেই; যদি রাজা ইচ্ছা করেন, তা হলে তাঁর যে কোন শত্রুকে ম্যাজিলান পরাজিত করতে পারেন।

এই সময় সেবুর রাজার সঙ্গে ম্যাজিলানের খুব বন্ধুত্ব হল। ম্যাজিলানের কথা শুনে সেবুর রাজা আশান্বিত হলেন, কারণ তাঁর রাজ্যের কাছেই ম্যাক্টান দ্বীপে তাঁর এক প্রতিদ্বন্দ্বী বন্য রাজা ছিল। সেবুর রাজার কথায় ম্যাজিলান সঙ্গে মাত্র ষাট জন লোক নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন।

ম্যাক্টান দ্বীপে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল অসংখ্য সশস্ত্র বন্য লোক তাঁদের ঘিরে ফেলে আক্রমণ করেছে। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলবার পর ম্যাজিলান বুঝলেন যে, এইখানেই জীবনের প্রথম পরাজয়কে মেনে নিতে হবে। কিন্তু তাঁর জন্যে তাঁর লোকেরা মরবে কেন?

সেই মুহূর্ত্তে তিনি তাঁর সঙ্গের সমস্ত লোকদের বোটে উঠে পালাবার আদেশ দিলেন। তিনি আর তাঁর ছ'জন বিশ্বস্ত সঙ্গী তাদের আগলে ধীরে ধীরে পিছিয়ে চলতে লাগলেন। সমস্ত আক্রমণের বোঝা এসে পড়ল তাঁদের সাত জনের ঘাড়ে।

তাঁর সঙ্গীরা যখন নৌকাতে চড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখনও তিনি তীরে দাঁড়িয়ে তারস্বরে তাঁদের উপদেশ দিচ্ছেন, কি ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করতে হবে!

দেখতে দেখতে বন্যলোকেরা তাঁকে আর তাঁর

অবশিষ্ট ছ'জন সঙ্গীকে ধরাশায়ী করল! তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়ে তুলে, টুক্‌রো টুক্‌রো করে তাঁর দেহ কেটে সাগরজলে ভাসিয়ে দিল।

অশ্রান্ত পথিকের পথ-চলা শেষ হয়ে গেল!

তাঁর সঙ্গীরা সেবুতে ফিরে এসে, সেখান থেকে অশ্রুসিক্ত চোখে মলাক্কাস্ দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাত্রা করল। সঙ্গে আর দলপতি নেই, যাত্রাও শেষ হয়ে এসেছে।

কনসেপ্সন্ জাহাজখানি একেবারে অপটু হয়ে পড়ায় সেবুতেই তাকে পরিত্যাগ করে রেখে আসা হয়।

পাঁচখানি জাহাজের মধ্যে তিনখানি ছিল। তার মধ্যে একখানি গেল। বাকি রইল দুখানি।

সেই দু'খানি জাহাজ, ভিক্টোরিয়া আর ত্রিনিদাদ্ ১৫২১ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর মলাক্কাস্ দ্বীপে এসে পৌঁছল।

মলাক্কাস্ দ্বীপে তাঁরা দু'সপ্তাহ রইলেন। যাবার সময় তাঁরা দেখেন ত্রিনিদাদও অচল হয়ে এসেছে। ত্রিনিদাদ ছিল ম্যাজিলানের নিজস্ব জাহাজ।

ত্রিনিদাদকে ফেলে রেখে একখানি জাহাজ আবার স্পেনের দিকে যাত্রা করল।

পথে 'টাইডোর' দ্বীপে বন্যজাতিদের মধ্যে হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে একদল পর্ত্তুগীজ নাবিকদের দেখা হয়ে গেল। তাঁরা পূর্ব্বপথ ধরে এই দ্বীপে এসে পৌছিয়েছেন, ম্যাজিলানের লোকেরা পশ্চিম পথ ধরেও সেই একই যায়গায় এসে পৌছিয়েছেন।

সেই 'টাইডোর' দ্বীপে তাঁরাই প্রথম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বুঝলেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া একমাত্র ঘরের দিকে ফিরল। বেরিয়েছিল পাঁচখানি জাহাজ, জয়ী হয়ে ফিরল মাত্র একখানি!

দুর্গম পথের যে এনে দিল সন্ধান, সেই ঘুমিয়ে রইল দুর্গমের সুগভীরতার মধ্যে।

পথ থেকে সে-ই আর ফিরে এল না ঘরে।
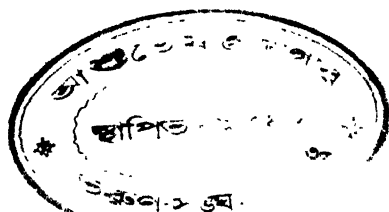
টাইডোর দ্বীপে পশ্চিমগামী ম্যাজিলানের দলের সঙ্গে পূর্ব্বগামী অপর দলের সাক্ষাৎ। ভৌগলিক ইতিহাসে পৃথিবীর গোলাকারত্বের প্রথম প্রামাণিক ঘটনা।

—পৃঃ ৬৮

# রেণে কাইয়ে

—ঃ০ঃ—

আফ্রিকার দুর্গম পথের সঙ্গে মঙ্গোপার্ক, লিভিংষ্টোন এবং ষ্ট্যানলীর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। এই তিন জনের কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু রেণে কাইয়ে—এ নামের সঙ্গে আমরা তত পরিচিত নই। তিনিও একজন দুর্গম পথের যাত্রী এবং ফ্রান্সের আবিষ্কারের ইতিহাসে এই দুঃসাহসী যুবকটীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

রেণের জীবনী আরম্ভ করবার আগে, একটা কথা বলে নিতে চাই। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ যীশুখৃষ্ট জন্মাবার চারশো চুরাশী বছর আগে জন্মেছিলেন। আফ্রিকার দুর্ভেদ্য বন্য-রহস্য তাঁর মনকেও টেনেছিল—তিনি আফ্রিকার অন্তরঙ্গ দেশের কিছু কিছু কাল্পনিক চিত্রও রেখে গিয়েছিলেন। সেই দিন থেকে

এই সেদিন, ১৯১০ সালের ২রা এপ্রিল—যেদিন নাইগার নদীর জল-ধারার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করবার জন্যে লেফ্টেনান্ট বয়েড আলেক্জাণ্ডার মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে নিহত হন—দলের পর দল দুঃসাহসী যাত্রী আফ্রিকার মরুপথে এই অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হয়ে এসেছেন এবং সেই সব দুর্গম পথের যাত্রীদের কঠোর সাধনার ফলে আজ মাত্র এই কয়েক বছর হলো, আফ্রিকার অন্তঃস্থলের পরিচয় বিংশ শতাব্দীর জগৎ জানতে পেরেছে।

মধ্যযুগে য়ুরোপের বন্দরে বন্দরে নাবিকদের মুখে মুখে নানা কাল্পনিক নগরের কথা ঘুরে বেড়াতো। লোকের ধারণা ছিল, সেই সব নগরের পথে পথে সোনা ছড়ান আছে—কোন রকমে গিয়ে পড়তে পারলেই হয়।

ঠিক এমনি ধারা আফ্রিকার এক শহরের কথা য়ুরোপের দুঃসাহসী পর্য্যটক-মহলে সে সময় খুব চল্তি ছিল। সে শহরটীর নাম 'টিম্বাক্টু'। কেউ কেউ মনে করতেন, নীল নদের উপরে এই শহর, অথবা এমন একটা নদীর উপর, যার পরিচয় তখনও য়ুরোপ পায় নি। সেখানে না কি থান থান সোনা ছড়ান আছে—মূর নাবিকরা বলতো, সে রকম শহর না কি জগতে আর হয় না।

মরুভূমির ওপারে কোথায় টিম্‌বাক্টু? কোন্ সে নদী, যার তীরে রয়েছে এই ভূ-স্বর্গ? দলে দলে যাত্রীরা বেরুলো মরুভূমির ওপারে টিম্‌বাক্টুর পথে!

রেণে কাইয়ে যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন টিম্‌বাক্টুর খবর কেউই পায় নি (১৭৯৯)। তিনিই প্রথম টিম্‌বাক্টুর প্রকৃত খবর জগৎকে জানিয়ে যান। একা পায়ে হেঁটে তিনি টিম্‌বাক্টু গিয়েছিলেন।

রেণের বাবা একজন সামান্য রুটীওয়ালা ছিলেন। অতি কষ্টে তাঁদের সংসার চলতো। রেণে যখন নিতান্ত শিশু, তখন তাঁর মা-বাপ দুজনেই মারা যান—তাঁকে একেবারে একা ফেলে রেখে।

রেণের এক কাকা তাঁর লালনপালনের ভার নিলেন।

গ্রামের জীবন—সাধারণতঃ কোন কোলাহল নেই, অন্তরকে হঠাৎ জাগিয়ে দেবার মত কোন গতিপ্রবাহ নেই।

হঠাৎ সেই কোলাহলহীন গতিহীনতার মধ্যে কোথা থেকে আসে এক সার্কাসের দল। সমস্ত গ্রামটা হঠাৎ যেন জেগে ওঠে। তারপর তারা চলে যায়। গ্রামটা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। বালক ভাবে, কোথা থেকেই বা এলো তারা, গেলোই বা কোথায়?

একদিন সেই নিঝুম গ্রামে সহসা মহাকাল স্বয়ং তাঁর চরণ-চিহ্ন রেখে চলে গেল। কয়েক ঘণ্টার জন্যে নেপোলিয়ান তাঁর সৈন্যদল নিয়ে সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন। বালক ভাবে, কোথায় গেল তারা? কোথা থেকেই বা এলো?

বই না পড়লে না কি সে-সব জানা যায় না। বালকের বাসনা হলো—সে বই পড়বে। ধীরে ধীরে আপনার চেষ্টায় সে পড়তে শিখলো। যে-কাকার কাছে সে থাকতো, তিনি তাকে মুচীর কাজ শিখিয়ে একজন মুচীর সঙ্গে জুতে দিলেন। জুতো মেরামত করে রেগে দু'এক পয়সা রোজগার করতে লাগলেন।

দিনের বেলা জুতো সেলাই করে বেড়ান—সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে বই নিয়ে পড়তে বসেন। রাত্রি শেষ হয়ে যায় —আবার সূর্য্যের আলো দেখা দেয়! সারারাত্রি ছাপার সেই কালো অক্ষরগুলো তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

একদিন রাত্রি বেলায় এমনি ধারা এক বই-এর পাতায় খেলে দেখা পেলেন, টিম্বাক্টুর। মরুভূমির ওপারে এক রহস্যনগর, কেউ না কি য়ুরোপ থেকে সেখানে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারে নি, দুর্দ্ধর্ষ মূরেরা সেখানে তাল তাল সোনা আগলে বসে আছে—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে

রাস্তা—রাস্তার দু'ধারে মিনার-ওয়ালা বাড়ী, মিনারের চূড়ায় মোড়া সোনা সূর্য্যের আলোয় ঝকমক্ করছে! হায় টিম্‌বাক্‌টু!

রেণে ফ্রান্সের নির্জ্জন গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন টিম্‌বাক্‌টুর পথে, একা।

রেণে যে গ্রামে বাস করতেন, তার নিকটতম বন্দর হ'লো রোচেফোর্ত। প্রথমে তিনি পায়ে হেঁটে রোচে-ফোর্ত-এ এলেন। সেখান থেকে আফ্রিকাতে পৌঁছবার উপায় খুঁজতে লাগলেন।

সেই সময় ফরাসী সরকার থেকে একটা জাহাজ আফ্রিকায় যাচ্ছিল। রেণে চেষ্টা-চরিত্র করে সেই জাহাজে চাকরের একটা চাকরী যোগাড় করে নিলেন।

আফ্রিকায় নেমে রেণে হাঁটতে সুরু করলেন। রূপকথার মত কেটে যেতে লাগলো তার দিন। চারিদিকে সবুজ সুন্দর প্রকৃতি। নতুন দেশ, নতুন রূপ। রেণের মন ডুবে গেল। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে রেণে ভিতরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুদিন পরেই রূপকথার রাজ্য শেষ হয়ে এলো। এলো মরুভূমি—দিগন্ত-বিস্তৃত! এলো তৃষ্ণাময়

জলহীন আফ্রিকার মরুপথ। সঙ্গে এলো আফ্রিকার দুর্দ্দান্ত মরু-জ্বর! সেই অবস্থায় রেণে আর অগ্রসর হতে পারলেন না! মরণাপন্ন হয়ে কোন রকমে আবার পশ্চিম উপকূলে ফিরে এলেন। সেখানে কয়েক মাস হাসপাতালে বাস করবার পর, তিনি আবার পথে বেরুলেন—আত্মীয়হীন, সহায়হীন, নিঃস্ব ভিখারী। কোন রকমে এক যায়গায় একটা রাঁধুনার চাকরী যোগাড় করলেন এবং ফ্রান্সে ফিরে যাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

রেণে ফ্রান্সে ফিরে এলেন, কিন্তু টিম্‌বাক্‌টুর কথা ভুললেন না। চার বছর পরে তিনি আবার আফ্রিকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন—সেই একই উদ্দেশ্য—টিম্‌বাক্‌টুতে পৌঁছতেই হবে। কি করে পৌঁছতে হবে, কিছুই জানা নেই, শুধু আছে সু-তীব্র বাসনা—লক্ষ্যে পৌঁছতেই হবে!

আফ্রিকায় পৌঁছে রেণে ঠিক করলেন, সেনেগাল প্রদেশের গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর অন্তরের বাসনার কথা জানাবেন এবং এই উদ্যোগে তাঁর সহায়তা কামনা করবেন।

তখন সেনেগালের গভর্ণর ছিলেন ব্যারন রোজার।

রেণে ব্যারন রোজারের নিকট উপস্থিত হয়ে সব কথা জানালেন। রেণের কথা শুনে ব্যারন রোজার হেসে উঠলেন। বললেন, টিম্‌বাক্‌টু আবিষ্কার করতে চাও? মনে করেছ ফ্রান্সের উপত্যকা বেয়ে হাঁটার মতন কতকটা ব্যাপার, না? এস, এই দেখ ম্যাপ, এতে সব লেখা আছে, তোমার আগে যারা এসেছিল আফ্রিকার মরু-পথে টিম্‌বাক্‌টুকে খুঁজে বার করবার জন্যে—এই দেখো।

১৬১৮ সালে টমসন! তলায় কি লেখা আছে দেখো।

নিহত!

১৭৯০ সালে মেজর হাফ্‌টন্‌! তলায় কি লেখা আছে দেখো!

মরুপথে অদৃশ্য!

তারপর দেখো, উইন্‌টার্‌বটম্‌—

মৃত—মরুজ্বরে!

এখানেই শেষ নয়—এই দেখো হর্ণম্যান্‌—

মৃত—মরুপথে!

তারপর এই দেখো—সকলের চেয়ে যার নাম আজ ভুবনে বিদিত, সেই মঙ্গোপার্ক—

নিহত!

এই দেখ...পেডী, ক্যাম্বল্, গ্রে...........

পীতজ্বরে মৃত !

তারপর এই দেখো, গিয়েছে বোঁফোর্ত—কোনও সন্ধান নেই তার। বোঁফোর্ত যে বেশী দূর অগ্রসর হ'তে পেরেছে, তা আমার মনে হয় না !

রেণে বাধা দিয়ে বল্লেন, যদি ঔদ্ধত্য ক্ষমা করেন, তা হলে বলি, বোঁফোর্ত কৃতকার্য্য হতে পারেন না—অত লটবহর, সাক্ষী-সাবুদ, ঘোড়া-গাধা নিয়ে এ সব কাজ হয় না !

হঠাৎ যুবকের মুখে সে কথা শুনে রোজার এবার ভাল করে যুবকের মুখের দিকে চাইলেন। বললেন, কিন্তু তোমার টাকা-পয়সা নেই, কোন সহায় নেই, কোন আভিজাত্য নেই, কোন পরামর্শদাতাও নেই—তুমি কি করে মনে কর যে, এই দুরূহ কাজে তুমিই সফল হ'তে পারবে ?

সোজা রোজারের মুখের দিকে চেয়ে রেণে বললেন—আমার স্বপক্ষে একটী মাত্র জিনিষ আছে—সে হ'লো আমার দৈন্যের শিক্ষা ! নিকটতম সহর থেকে তিনশ' মাইল দূরে, মরুভূমির মধ্যে কি হবে আমার আভিজাত্যে, কি হবে আমার ধন-সম্পদে, কি হবে আমার লোক-

লস্করে। সফলতা তারই হবে, যে সয়েছে মরু-সূর্য্যের তাপ, যার দেহ জানে তৃষ্ণার জ্বালা কি করে সইতে হয়! সেই পারবে, যে পারে অনাহারের সঙ্গে ঘর করতে, তপ্ত-বালুকার সঙ্গে যুঝতে—যার মনে আছে লক্ষ্যের প্রতি অচঞ্চল দৃষ্টি! প্রথমে আমি এখানকার লোকদের ভাষা এবং রীতিনীতি শিখতে চাই! আমি ঠিক করেছি, তাদের দেশে গিয়ে আমি পরিচয় দেবো যে, আমি একজন ধনী ফরাসী বণিকের সন্তান, তাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করতে চাই!

রেণের কথা শুনে রোজার বুঝলেন যে, এ যুবক মিথ্যা বাগাড়ম্বর করে নি! সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বললেন, তুমি যাও, প্রয়োজন হলে তুমি আমার পূর্ণ সহায়তা পাবে!

রোজারের নিকট থেকে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র নিয়ে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে রেণে যাত্রা সুরু করলেন। য়ুরোপীয় পোষাক-পরিচ্ছদ বদলে, পাকা মুসলমানের পোষাক পরলেন।

পাঁচ সপ্তাহ পথ-চলার পর তিনি এক মূরদের রাজ্যে এলেন। সেখানকার রাজার সঙ্গে দেখা করে, তাঁর কথা জানিয়ে বললেন, তিনি সেখানে থেকে লেখাপড়া

শিখে কোরাণ পড়তে চান, কারণ তিনি স্থির করেছেন যে, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করবেন।

তাঁর সেই কথা শুনে সেখানকার রাজা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন, কারণ তাঁরাও ছিলেন মুসলমান। তিনি রেণেকে আশ্রয় দিলেন।

রেণে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে স্কুলে যেতে লাগলেন। শুধু মূরদের ভাষা শেখা নয়, দিনের পর দিন, তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সমস্ত আয়ত্ত করতে লাগলেন।

অন্য দিক থেকেও তিনি গোপনে শিক্ষা নিতে লাগলেন। যখনি সুবিধা পেতেন, আমরা যেমন হাওয়া খেতে সিমলা-দার্জ্জিলিং বা মধুপুর যাই, তেমনি তিনি মরুভূমির মধ্যে চলে যেতেন। দিনের পর দিন মরুভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে দেহকে মরুবেদনার উপযুক্ত করে গড়ে তুললেন।

এই ভাবে এক বছর কেটে গেল। এই এক বছরের মধ্যে রেণে নিজেকে যেমন একজন পাকা মূর হিসেবে গড়ে তুললেন, অন্যদিকে তাঁর আচার-ব্যবহারে তাঁর সম্বন্ধে কারুরই সন্দেহ করবার মত কিছু রইল না। এবার সময় হ'লো তাঁর যাবার।

একদিন রাত্রিবেলা নিঃশব্দে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

পথে একদল আরবযাত্রীর সঙ্গে দেখা হ'লো। রেণে তাদের সঙ্গে পরিচয় করে জানালেন যে, তিনি মিশরের লোক—মিশরে তাঁর বাড়ী। সেইখানেই ফিরে যাচ্ছেন। এই বলে তিনি তাদের দলে ভিড়ে পড়লেন।

যাত্রীর দল যতই এগোয়, ততই চোখে পড়ে শস্যশ্যামল দেশ। রেণে দু'চোখ ভরে সেই শোভা দেখতে দেখতে চললেন। রাত্রিবেলায় তাঁবুতে যখন সবাই ঘুমোয়, তখন কোরাণ বার করে, তার আড়ালে সব পথের বিবরণ লিখে রাখেন।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ চলতে চলতে যাত্রীর দল এক নদীর তীরে এসে পৌঁছল। যে নদীর কিনারা য়ুরোপের পর্য্যটকেরা দেখতেন কল্পনায়, এ সেই নাইগার নদী! উল্লাসে রেণের বুক ভরে উঠল!

কিন্তু সেখান থেকে তাঁর সহযাত্রীরা অন্য পথ ধরল। রেণে থেকে গেলেন। কারণ, তাঁকে যেতে হবে টীম্‌বাক্‌টু।

কয়েকদিন বিশ্রাম করে রেণে আবার পথে বেরুলেন। এবার সুরু হ'লো মরু-পথ। দেখতে দেখতে

চোখের সামনে থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তৃণ-লতার শ্যামল রূপ। যত দূর অগ্রসর হন, ততই চোখে পড়ে বৈচিত্র্যহীন তপ্ত বালুকার দিগন্তবিস্তৃত তাম্ররূপ।

হঠাৎ এই সময় তিনি দুরন্ত 'স্কার্ভি' রোগে আক্রান্ত হলেন। একা, কেউ দেখবার নেই, কেউ শুশ্রূষা করবার নেই, মুখে জল দেবার পর্য্যন্ত কেউ নেই। রেণে স্পষ্টই বুঝলেন, টিম্‌বাক্‌টু পৌঁছান আর হ'লো না। তাঁর আগে যাঁরা এই পথে এসেছেন, তাঁদেরও ভাগ্যে যা ঘটেছে, তারও ভাগ্যে তা-ই ঘটবে! রোগের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে দিবারাত্র তিনি ভগবানের কাছে মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন! কিন্তু, মৃত্যু তাঁর হ'লো না। রেণে উঠে দাঁড়ালেন, একেবারে কঙ্কাল!

তবুও রেণে চলতে আরম্ভ করলেন। পথের মাঝখানে থেমে কি লাভ?

দু'মাস পরে তিনি 'জিন্' শহরে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে শুনলেন, টিম্‌বাক্‌টুতে একটা বোট যাচ্ছে, মাল-পত্র নিয়ে। হাতে-পায়ে ধরে তিনি সেই নৌকাতে একটু যায়গার বন্দোবস্ত করে নিলেন।

১৮২৮ সালের ২০শে এপ্রিল—রাত্রির অন্ধকারে রেণে কল্পপুরী টিম্‌বাক্‌টুতে প্রবেশ করলেন। এর আগে

আর কোন যুরোপীয় টিম্‌বাক্‌টুতে প্রবেশ করতে পারে নি।

আশায়, আনন্দে, মোহনীয় কল্পনায় রাত্রি শেষ হ'লো। প্রভাত-আলোয় টিম্‌বাক্‌টুকে তিনি দেখলেন, কিন্তু এ কি তার রূপ। যুরোপের পর্য্যটকেরা টীম্‌বাক্‌টুর যে-রূপ কল্পনায় এঁকেছিল, এ-নগরতো সে-নগর নয়। অতি সামান্য নগর, এলো-মেলো পোড়া মাটীর বাড়ী সব এ-দিকে ও-দিকে ছড়িয়ে আছে, চারিদিকে মরুভূমি, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত খাঁ খাঁ করছে!

সেইখানে থেকে রেণে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করতে লাগলেন। সেই সমস্ত সংগৃহীত বিবরণ তিনি রাত্রিবেলায় লিখে রাখতেন। এইভাবে কয়েক দিন টিম্‌বাক্‌টুতে কেটে গেল।

টিম্‌বাক্‌টুর সামনেই ছিল, মরু শাহারা। রেণে ঠিক করলেন—তিনি শাহারা অতিক্রম করে অগ্রসর হবেন।

সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি এক বিরাট যাত্রী দলের দেখা পেলেন। একটা চলন্ত শহর, চারশো লোক, চার হাজার মাল-বোঝাই-করা উট, সঙ্গে প্রত্যেকের লট-বহর। রেণে সেই দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়লেন।

দিনের বেলা পথ চলবার কোনও উপায় নেই। রাত্রিবেলায় যাত্রীর দল চলে, আর দিনের বেলা যে-যার তাঁবুতে বসে থাকে, ঘুমায়। দিনের বেলা তাঁবু থেকে বেরোয়, কার সাধ্যি !

এমনি ভাবে কয়েকদিন এক রকম ভালয় ভালয় গেলো। হঠাৎ একদিন দুপুরে উঠলো তুমুল ঝড়, মরুভূমির বালির ঝড়। কোথায় উড়ে গেল তাঁবু— কোথায় উড়ে গেল সব মাল-পত্র। রেণের মনে হ'লো একটা তরল বেগবান্ আগুনের নদীতে তাঁরা সবাই যেন ডুবে গিয়েছেন। চোখের পাতা পর্যান্ত ঝলসে পুড়ে গেল।

ঝড় থেমে গেল, সুরু হ'লো তৃষ্ণার হাহাকার। তৃষ্ণায় উন্মাদের মত লোকে, যে যেদিকে মনে করলো জল আছে সেদিকে ছুটতে লাগলো ! কিন্তু কোথায় জল ? বহু অনুসন্ধানের পর পাতকূয়ো পাওয়া গেল, কিন্তু তা বালিতে ভরে গিয়েছে ! সেইখানেই কয়েকজন চিরকালের মত শুয়ে পড়ল।

রেণে তবুও চলতে লাগলেন—গায়ের সাদা রঙ পুড়ে কাল হয়ে গিয়েছে। চক্ষু কোটরগত—শরীরে কোথাও একটু মাংসের চিহ্ন নেই—একটা জীবন্ত প্রেত-মূর্ত্তি !

এইভাবে কুড়িদিন অতিক্রম করার পর, তিনি মরক্কো শহরে এসে পৌছলেন। কোথায় যাবেন? য়ুরোপীয় বলে পরিচয় দিলে, কোন য়ুরোপীয় বিশ্বাস করবে না। এমনি ধারা হয়ে গিয়েছে তাঁর চেহারা!

শত-ছিন্নবাসে রেণে মসজিদে মসজিদে ভিখারীর মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, একমুঠো আহার্য্য যদি কোথায়ও জোটে। সেখান থেকে তিনি ঠিক করলেন, 'র‍্যাবাট'-এ যাবেন। একজন ফরাসী কন্‌সাল্ তখন 'র‍্যাবাট'-এ বাস করতেন।

রেণে যখন 'র‍্যাবাট'-এ গিয়ে পৌছলেন, তখন তাঁর দাঁড়াবার শক্তি নেই। কোন রকমে কন্‌সালের বাড়ীর সামনে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। শুধু কোন রকমে জানালেন, তিনি একজন ফরাসী, আফ্রিকা পায়ে হেঁটে এসেছেন—সাহায্য এবং আশ্রয় চান!

কিন্তু, এমনি দুর্ভাগ্য তাঁর যে, কন্‌সালের বাড়ীর লোকেরা তাঁকে পাগল মনে করে রাস্তাতেই ফেলে রেখে দিল। সেইখানেই অচেতন অবস্থায় তিনি শুয়ে ছিলেন। পথের কুকুরগুলো তাঁকে খাদ্যহিসেবে দল বেঁধে আক্রমণ করতে আসায়, তাঁর চমক ভাঙ্গলো।

সেখান থেকে উঠে, তিনি চলতে লাগলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? সব চেয়ে নিরাপদ্ যায়গা মনে হ'লো, গোরস্থান! গোরস্থানে তিনি রাত কাটালেন।

সকাল বেলা রেণে 'টান্‌জিয়ার' অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে ছিলেন কন্‌সাল্ দালাপোর্তে। দালাপোর্তে ছিলেন আবিষ্কারক এবং পর্য্যটকের বন্ধু!

৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রিবেলা রেণে 'টান্‌জিয়ার'-এ ফরাসী কন্‌সালের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। দরজায় ছিল একজন য়িহুদী দ্বারী। তার সামনে গিয়ে রেণে জানালেন যে, তিনি দালাপোর্তের সঙ্গে দেখা করতে চান। য়িহুদী দ্বারীটি রেণের চেহারা দেখে ভীত হয়ে তাঁকে বাড়ীতে ঢুকতে দিল না। উন্মাদ ভিখারী কার সঙ্গে দেখা করতে চায়?

দালাপোর্তে কৌতূহলী হয়ে নেমে এসে দেখেন, একজন উন্মাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? কি চাও?

রেণে বললেন, আমি রেণে কাইয়ে, আপনার আশ্রয় চাই।

দালাপোর্তে রেণের নাম শুনেছিলেন। তিনি জানতেন যে, সেই যুবক অসাধ্যসাধনের জন্যে মরু-দেশে

যাত্রা করেছিল। ছুটে গিয়ে তিনি রেণেকে আলিঙ্গন করে বাড়ীতে টেনে নিয়ে এলেন।

তিন হাজার ছ'শো মাইল মরু-পথ অতিক্রম করে এসে, অবশেষে বিশ্রামের ঠাঁই মিললো!
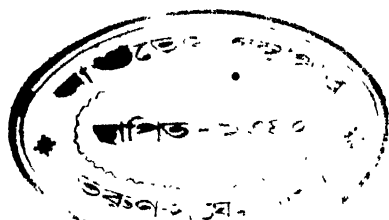
# রোয়াল্‌ড্‌ আমুন্‌ড্‌সেন

-:o:-

পুরাকালে নরওয়ে দেশে এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাদের বলা হতো 'ভাইকিং'।

সমুদ্রের তরঙ্গে ছিল তাদের ঘর, ঝড় ছিল তাদের খেলার সাথী।

যখন তারা বৃদ্ধ হতো, তখন বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায় তারা ঘরে বসে থাকতে পারত না। পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার সময় নিকট হয়েছে জানতে পারলেই, একদিন তুমুল ঝড়ের মধ্যে, সমুদ্রে যখন ঢেউ পাগল হয়ে নাচতে সুরু করতো, তারা ছোট্ট একখানি নৌকা নিয়ে তারই মধ্যে বেরিয়ে পড়ত,—হাতে চিরজীবনের সঙ্গী খোলা তলোয়ার, বুকে লোহার বর্ম্ম আঁটা,—পায়ের তলায় নাচত সমুদ্র, মাথার উপরে ডাকতো

দুর্গম পথে

রেয়াল্ড্‌ আমুন্ড্‌সেন

—পৃঃ ৫৬

বাজ! সেই নির্জ্জন ভয়ঙ্কর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তারা নিঃশেষে নিজেদের বিলিয়ে দিত!

এ হ'ল বহুকাল আগেকার কথা।

আজ 'ভাইকিং'রা নরওয়ের সমুদ্র-উপকূল থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের আত্মা এখনও মাঝে মাঝে কোন কোন নরওয়েবাসীর মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠে আমাদের পরবশ জীবনে জানিয়ে দিয়ে যায় যে, সেই আদিম মানব-মন এখনও বেঁচে আছে, একা বেঁচে আছে সেই ভয়হীন মানুষের মন, একদা বিনা আয়ুধে বিনা-বিজ্ঞানে যা নগ্ন-দেহ নিঃসম্বল মানুষকে সমগ্র প্রাণিরাজ্যের সিংহাসনে বিজয়ী করে বসিয়েছিলো!

রোয়াল্ড্ আমুন্ড্সেন হলেন নরওয়ের শেষ 'ভাইকিং'। পুরাকালের ভাইকিংদের ডাকতো তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, আমুন্ড্সেনকে ডেকেছিল মৃত্যু-হিম মেরু-তুহিন। সেই দিগন্ত-বিস্তৃত নিষ্কলঙ্ক মেরু-শুভ্রতার মধ্যে আমুন্ড্সেনের আত্মা মিশিয়ে আছে। দক্ষিণ-মেরুতে আছে তাঁর প্রথম পদরেখা, উত্তর-মেরুতে আছে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস!

•

দূর-দুর্গমতার আহ্বান রক্তের সঙ্গে নিয়েই তিনি

জন্ম নিয়েছিলেন ( ১৮৭২ )। তাঁর বাবা বোট তৈরী করতেন। তাতেই তাঁদের সংসার চলত।

ছেলেবেলা থেকেই মেরু-অভিযানের কাহিনীগুলি বালক আমুন্‌ড্‌সেন তন্ময় হয়ে পড়ত। মনে মনে বালক স্যর জন ফ্রাঙ্কলিনকে জগতের শ্রেষ্ঠ বীর-পুরুষ বলে বরণ করে নিয়েছিল। তখন কে জানত এই বালকই একদিন ফ্রাঙ্কলিনের অসমাপ্ত অভিযানকে সার্থক করে তুলবে! মেরু-সমুদ্রে ফ্রাঙ্কলিনের তিরোধানের সকরুণ কাহিনী বালকের মনকে বারবার অভিভূত করে তুলত।

তারা*দেখেছে, চোদ্দ দিন ধরে, অবিরাম অবিরত ছায়াহীন রাত্রি-দিনের মধ্য দিয়ে অবিচ্ছেদ চলেছে লক্ষ লক্ষ পেঙ্গুইন পাখীর দল! কোথায় পেঙ্গুইন পাখীর জন-হীন বরফের দেশ? কোনও মানুষের পায়ের দাগ এখনও সেখানে পড়েনি! আভেলাঁস্ ঠেলে মানুষ কি খুঁজে পাবে না সেখানে পৌঁছবার পথ? কোন্ দেশের পতাকা আগে উড়বে সেখানে? কে সে বীর, যার পায়ের দাগ প্রথম পড়বে সেই হিম-মৃত্যুর বুকে?

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বালকের অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠত।

সাদর্ণ ক্রশ পার্টি ( Southern Cross Party )

ভিচরাদের শেষ বিশ্রামস্থল
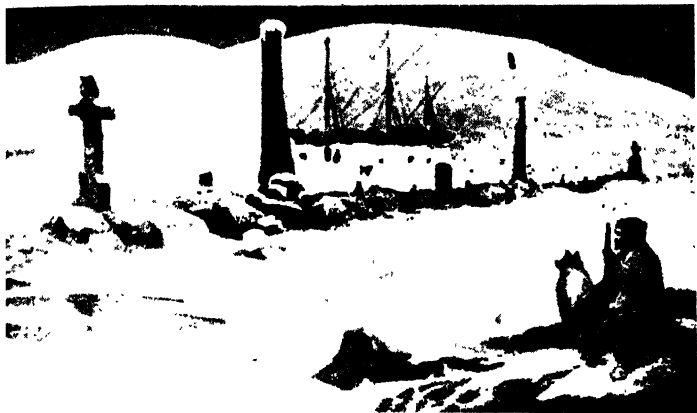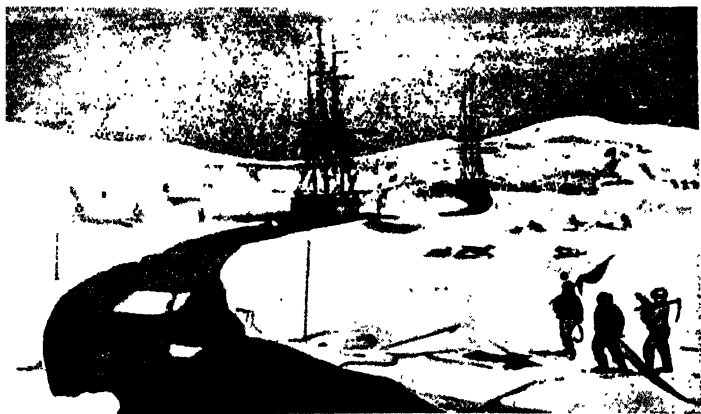
স্যর উইলিয়ম প্যারীর অভিযানকারী দল—
নর্থ-ওয়েষ্ট প্যাসেজ অনুসন্ধানে

পৃঃ ৫৮

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বালকের যখন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স, সেই সময় তার বাবা মারা গেলেন। প্রাণপণ চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করে বিধবা জননী ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবার আয়োজন করলেন। কিন্তু ডাক্তার হবার কোন বিষেয় আগ্রহ ছেলের দেখা গেল না। ছেলের একমাত্র কাজ "শী" চড়ে বরফের উপর দিয়ে ছোটা এবং শীতের মধ্যে, বরফের মধ্যে, ঘরের বাইরে থাকা অষ্ট-প্রহর। এইভাবে প্রথম যৌবন থেকেই আমুন্ড্সেন শীত আর বরফের মধ্যে নিজেকে শক্ত করে গড়ে তুলতে লাগলেন—মনে তখন থেকেই তাঁর দুর্ব্বার বাসনা, স্যর জন ফ্রাঙ্কলিন যে-পথ খুঁজে পান নি, আভালাসের পাহাড় এড়িয়ে সেই পথ তিনি খুঁজে বার করবেন।

জীবনের প্রথম পরীক্ষা রূপে তিনি ঠিক করলেন ভরা শীতে পায়ে হেঁটে 'অস্লো' থেকে 'বারগেন্' যাবেন। অর্থাৎ পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্র উপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত দেশটা পায়ে হাঁটবেন। একজন সঙ্গীও জুটে গেল। দুঃসাহসের প্রথম স্বাদ প্রথম অভিজ্ঞতাতেই পেতে হল। সেই তুষার-রাজ্যের মধ্যে তাঁরা পথ হারিয়ে ফেললেন। চার দিন অনাহারে সেই নিদারুণ শীত

আর তুষারের মধ্যে চলে আসার পর তাঁরা ‘বারগেন্’ এসে পৌঁছলেন। এই চার দিন অনাহারে কি করে যে তাঁদের কাটালো, তা তারাই জানেন।

সেই চারদিনের অনাহারে হ'ল মেরু-পথের প্রথম দীক্ষা !

কুড়ি বছর বয়সে সংসারের একমাত্র বন্ধন, তাঁর মা পরলোক গমন করলেন। মার ইচ্ছা এবং পীড়াপীড়িতেই তিনি ডাক্তারী পড়ছিলেন, মার মৃত্যুর পর তা ছেড়ে দিলেন। তখন, তাঁর প্রথম ঝোঁক হল, নাবিকের কাজ শেখা। খুঁজে খুঁজে দক্ষিণ মেরু-সাগরযাত্রী এক জাহাজে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নাবিকের সার্টিফিকেট অর্জ্জন করলেন : সেই সঙ্গে মেরু-সাগরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ-ভাবে তাঁর পরিচয় ঘটলো। সেদিন সে জাহাজে কেউ কল্পনাও করে নি যে, সামান্য শিক্ষানবীশ ছেলেটির দৃষ্টি ছিল মেরু সাগরের অপর তীরে—পেঙ্গুইন-পদ-রেখা অঙ্কিত তুষার-ভূমির দিকে।

পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনে একটা বড় সুযোগ এল। সেই সময় নরওয়ে থেকে ‘বেলজিকা’ জাহাজে ডি গারলাচির ( De Garlache ) অধীনে দক্ষিণ-মেরু

আবিষ্কারের জন্যে একটা অভিযান যাচ্ছিল। আমুন্ড্‌সেন 'বেল্‌জিকা'র প্রথম 'মেট' হলেন। সেই জাহাজে আর্কটউস্কী প্রভৃতি সেই সময়কার বড় বড় মেরু-আবিষ্কারকেরা ছিলেন। আমুন্ড্‌সেন সেই সুযোগে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হলেন।

কিন্তু এই অভিযান বিশেষ সফল হল না। দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলের 'গ্রাহামল্যাণ্ড' পর্য্যন্ত গিয়ে তাঁরা বরফে আটকা পড়ে গেলেন। সেখানে সেই অবস্থায় তাঁদের এক বছর কাটাতে হয়। তারপর তাঁরা ফিরে আসেন। অভিযান ব্যর্থ হলেও, সেই জাহাজের একজন নাবিকের কাছে এই অভিযানের বিশেষ সার্থকতা ছিল। সেই প্রথম, আমুন্ড্‌সেন তুষারাচ্ছন্ন ছেদ-হীন দীর্ঘ মেরু-রাত্রির সঙ্গে পরিচিত হলেন।

তাঁর উদ্‌গ্রীব মন শুধু ভাবছিল,—কবে, কবে আসবে তাঁর লগ্ন? তারই অপেক্ষায় তিনি নিজেকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিলেন।

এই সময় হঠাৎ আমুন্ড্‌সেনের দৃষ্টি দক্ষিণ-মেরু থেকে একেবারে উত্তর মেরু-সাগরে গিয়ে পড়ল। এখানে একটু ভূমিকা দরকার।

মেরু-আবিষ্কারের ইতিহাসে প্রায়ই 'নর্থ-ওয়েষ্ট প্যাসেজ' বলে একটা সমুদ্র-পথের উল্লেখ দেখা যায়। প্রায় চারশ' বছর ধরে য়ুরোপের নাবিকেরা উত্তর-য়ুরোপ থেকে সোজা পশ্চিম-দিকে গিয়ে উত্তর-আমেরিকার উত্তর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে আসবার সমুদ্র-পথ খুঁজছিল। এই সমুদ্র-পথকেই বলে 'নর্থ-ওয়েষ্ট প্যাসেজ',—এই সমুদ্র-পথের মত দুর্গম সমুদ্র-পথ আর নেই বললেই হয়। তবুও এই পথ খুঁজে বার করবার জন্যে উত্তর-মেরুর সমুদ্র-পথে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন। এই পথ খুঁজতেই স্যর ফ্রাঙ্কলিন লোক জন সমেত মেরু-সাগরে অদৃশ্য হয়ে যান। আবিষ্কারের ইতিহাসে সে এক অতি সকরুণ কাহিনী।

আমুন্ড্সেন ঠিক করলেন যে, মেরু-সাগরের মধ্য থেকে তিনি সেই উত্তর-পশ্চিম পথ খুঁজে বার করবেন। কিন্তু চারশ' বছর ধরে দেশ-বিদেশের নাবিকেরা লোক-জন সহায়-সম্বল নিয়ে যা পারে নি, তিনি একা নিঃসম্বল অবস্থায় কেমন করে তা পারবেন? তার উপর আর একটা বিশেষ কথা ছিল যে, চুম্বক-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকলে মেরু-সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নয়। কিন্তু কে তাঁকে শেখাবে?

অনেক কষ্টে তিনি হ্যান্সেনকে ধরলেন। কিন্তু 'কিউ অব্জার্ভেটরী' তাঁকে শিক্ষা দিতে রাজী হ'ল না! সেখান থেকে বিফল-মনোরথ হয়ে তিনি 'পোষ্টডাম'-এ চেষ্টা করলেন এবং সেইখান থেকেই তাঁর প্রয়োজনীয় বিদ্যা আয়ত্ত করলেন।

তা না হয় হল, কিন্তু মেরু-সাগরে যাবার মত জাহাজ কোথায়? অত ভাল জাহাজ 'ভাইকিং-'এর না হলেও চলে! মাত্র পঞ্চাশ টনের একখানি মাছ-ধরা জেলে-নৌকো পুরাণো অবস্থায় পড়ে ছিল। তিনি টাকা ধার করে সেটা অল্প দামে কিনে নিলেন। তারপর সেটা নিজের হাতে মেরামত করে নিলেন। সেই তো হ'ল তাঁর জাত ব্যবসা!

সঙ্গী যাঁদের পেলেন, তাঁরাও ঠিক তাঁরই মত দুর্দ্দান্ত উন্মাদ! পুরো 'ভাইকিং'দের বংশধর সব!

এই সামান্য আয়োজন করে ১৯০৩ সালে আমুন্ড্সেন উত্তর-মেরু সাগরের দিকে যাত্রা করলেন, উত্তর-পশ্চিম-পথ খুঁজে বার করতে—যে-পথ চারশ' বছরের চেষ্টাকে বারে বারে ব্যর্থ করে আভালাঁসের দুর্গমতার মধ্যে লুকিয়ে ছিল।

প্রথমে ফ্রাঙ্কলিনের পথ অনুসরণ করে তিনি চলতে

লাগলেন। ক্রমশঃ ফ্রাঙ্কলিনের সীমানা ছাড়িয়ে 'ব্যাফিন বে'র মধ্য দিয়ে, 'ল্যাঙ্কাষ্টার সাউণ্ড' এবং 'ব্যারো ষ্ট্রেট'-এর ভিতর দিয়ে, 'ছ লা রোকেয়েৎ' দ্বীপের ধার দিয়ে উত্তর মেরুকে পাশ কাটিয়ে তিনি 'সিম্প্সন্ ষ্ট্রেট'-এ এসে নোঙ্গর ফেললেন। আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। শীতে চারিদিক জমে বরফ হয়ে আসছে! শীত কাটাবার জন্যে বাধ্য হয়ে তাঁকে সেখানে থেকে যেতে হল। দুর্ভাগ্যক্রমে দু'বৎসর তিনি সেখানে আটক পড়ে থাকেন। তারপর ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে তিনি আবার যাত্রা করেন। 'ম্যাকেঞ্জী বে'র ধারে 'কিঙ্ পয়েণ্ট' পর্য্যন্ত যেতে না যেতেই আবার এসে গেল শীত। বাধ্য হয়ে আবার সেখানে আটকে যেতে হ'ল।

কিন্তু এবার তিনি চুপ করে বসে রইলেন না। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে থেকেই তিনি একটা 'শ্লেজ-পার্টি' গড়ে তুললেন। 'শ্লেজ'-এ করে তাঁরা ১৫০০ মাইল দূরে 'আলাস্কা'-র 'ঈগল সিটী'তে গেলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এলেন।

১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে আবার অভিযান সুরু হ'ল। নানা বিপদ এবং অভাবনীয় সব দৈব আক্রমণের হাত এড়িয়ে ১১০০ মাইল পথ অতিক্রম করে, তাঁরা ১৯০৬

সালের ১লা সেপ্টেম্বর 'বেরিং ষ্ট্রেট' পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়লেন। চারশ বছর ধরে যে পথ খোঁজা হচ্ছিল, সে-পথের দিশা পাওয়া গেল সেদিন!

সেখান থেকে আমুন্ড্সেন আমেরিকাতে ফিরলেন। উত্তর-পশ্চিম-পথের সন্ধানদাতা-রূপে আমুন্ড্সেনের নাম জগতের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি টাকা রোজগার করতে লাগলেন। সেই টাকাতে তাঁর সব ধার শোধ হ'লো। আমেরিকা ছেড়ে চলে আসবার সময়, যে জাহাজে উত্তর-পশ্চিম পথ পার হয়েছিলেন, সে জাহাজখানি তিনি রেখে এলেন।

আজও পর্য্যন্ত 'সান্ ফ্রান্সিস্কো'র 'গোল্ডেন গেট্' পার্কে এই ঐতিহাসিক কীর্ত্তির স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ জাহাজখানি সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে।

আমুন্ড্সেন যখন আমেরিকা থেকে নরওয়েতে ফিরে এলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁকে সাদরে বরণ করে নিলেন। জয়ী পুরুষের তালিকায় তখন তাঁর নাম লেখা হয়ে গিয়েছে।

আমুন্ড্সেন স্থির করলেন, এবার তিনি উত্তর-মেরু আবিষ্কার করতে বেরুবেন। সমস্ত প্ল্যান ঠিক করে তিনি নরওয়ে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। গভর্ণমেণ্টও তাঁকে সাহায্য করতে সম্মতি জানালেন।

যে জাহাজে (Fram) ন্যান্‌সেন উত্তর-মেরু অভিযানে গিয়েছিলেন, নরওয়ে গভর্ণমেণ্ট আমুন্‌ড্‌সেনকে সেই 'ফ্রাম' জাহাজখানি ব্যবহার করতে দিলেন। অভিযানের উপযুক্ত টাকা-কড়িও সংগৃহীত হ'ল। সবই ঠিক-ঠাক।

এমন সময় হঠাৎ খবর এল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কমাণ্ডার প্যেরী উত্তর-মেরুতে গিয়ে পৌঁছেছেন ( ১৯০৯, ৬ই এপ্রিল )। সঙ্গে তাঁর একজন কালো নিগ্রো, নাম ম্যালু হেন্‌সন। একজন শাদা আর একজন কালো, সেই দুটি লোক সর্ব্বপ্রথম উত্তর-মেরুতে একই সময় পদার্পণ করল! কিন্তু ম্যালু হেন্‌সনের নাম আজ আমরা কজনেই বা জানি!

আমুন্‌ড্‌সেনের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল। তার চেয়ে সহ্য করা কঠিন হ'ল, তাঁর আশৈশবের আশা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া—উত্তর-মেরুতে প্রথম পড়বে তাঁরই পায়ের রেখা, প্রথমে উড়বে তাঁরই হাতে-পোঁতা পতাকা!

কিন্তু আশা গেলেও, 'ভাইকিং' নিরাশ হয় না। উত্তর-মেরু-জয়ের গৌরব চলে গিয়েছে। কিন্তু আর এক প্রান্তে এখনও তো রয়েছে, তেমনি মানব-পদরেখাহীন—দক্ষিণ-মেরু! কাউকে কিছু না জানিয়ে, তিনি মনে

মনে স্থির করলেন, যেমন করেই হ'ক দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছতে হবে।

পরের বছর 'ফ্রাম্' জাহাজে তিনি দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন। তখন কেউ-ই ভাবে নি যে, আমুন্ড্সেন দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছুবার অভিযানে বেরিয়েছেন—সকলে জানল যে, তিনি 'বেরিং ষ্ট্রেট' অঞ্চলে যাত্রা করেছেন।

এখানে অন্য পূর্ব্ববর্ত্তী দক্ষিণ-মেরু-পথযাত্রীদের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

দক্ষিণ-মেরু একেবারে বরফে ঢাকা। চোদ্দ হাজার মাইল তীর-ভূমির মধ্যে মাত্র চার হাজার মাইল বরফ-শূন্য। সেই তুষারের রাজ্যে মাঝে মাঝে পরিপূর্ণ-তুষারের পাহাড় উঠেছে—পাহাড় নয়, আগ্নেয়গিরি। চিরতুষারে ঢাকা আগ্নেয়গিরি!

কিসের লোভে মানুষ এই 'ব্লিজার্ড'-এর দেশের খোঁজে বেরিয়েছিল? আজও পর্য্যন্ত এই তুষার-রাজ্যের চার ভাগের মাত্র একভাগে মানুষের পায়ের দাগ পড়েছে, আর তিনভাগ তেমনি অজানা পড়ে আছে। যেটুকু অংশ জানতে বা দেখতে পারা গিয়েছে, তার মধ্যে

কোথাও কোথাও কয়লার স্তরের সন্ধান মানুষ পেয়েছে। মানুষের আশা, কে জানে, সেই বরফের তলায় কি খনি-সম্পদ্‌ই না লুকিয়ে আছে!

কয়লার না হোক্‌, ইন্ধনের খোঁজেই দুঃসাহসী নাবিকের দল দক্ষিণ মেরু-সাগরের দিকে একটু একটু করে এগুতে থাকে। আলোর জন্যে দরকার ছিল তেলের। দক্ষিণ-মেরুসাগর-বাসী শীল আর তিমির উপর পড়ল মানুষের নজর, কারণ, তাদের দেহের চর্ব্বিতে আছে প্রচুর তেল। অতএব য়ুরোপের নাবিকদের বুলি হল, Southward Ho!

এই সব শীল আর তিমি-শিকারীর দলই 'দক্ষিণ-জর্জ্জিয়া,' 'দক্ষিণ-সেটল্যাণ্ড' প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার করে। অবশ্য তাদের ধারণা ছিল যে, সেই সব দ্বীপগুলিই হ'ল দক্ষিণ-মেরুর আসল অংশ। এই জাতীয় শিকারীদের মধ্যে জন বিস্‌কো এবং জেমস্‌ ওয়েড্‌ডেলের নাম দক্ষিণ-মেরুর ভূগোলে * অবিস্মরণীয় আছে।

দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের প্রথম স্মরণীয় তারিখ হ'ল, ১৭ই জানুয়ারী, ১৭৭৩; কারণ এই দিন ক্যাপটেন কুক্‌ সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণ-মেরুবেষ্টনীর মধ্যে পৌঁছেছিলেন।

* Biscoe Island, Weddell Sea.

তারপরে, ক্যাপ্টেন ফন্ বেলিংসাউসেন (১৮১৯-২১) —৭০° পর্য্যন্ত। 'পিটার দি ফার্ষ্ট' এবং 'আলেকজান্দার দি ফার্ষ্ট দ্বীপ' আবিষ্কার করেন।

জেমস্ ওয়েড্ডেল্—৭৫° পর্য্যন্ত। 'ওয়েড্ডেল' উপসাগর আবিষ্কার করেন।

জন বিসকো—'গ্রাহামল্যাণ্ড', 'আডেলেড' দ্বীপ, 'বিস্কো' দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

ডুর্ভিল্ (D'urvilla)*—যাঁর নামে 'ডুরভিল্' সাগর হয়েছে।

চার্লস্ উইলকিস্—'উইলকিস্ ল্যাণ্ড' পর্য্যন্ত।

স্যার জেমস্ ক্লার্ক রস—'মাউণ্ট সাবাইন'-এর নামকরণ করেন। ৭৫° ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। 'পসেসন্' এবং 'বউলম্যান' দ্বীপ ও তুইটি আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেন। আগ্নেয়গিরি তুটির নাম দেন 'মাষ্ট টেরর' (Must Terror) এবং 'মাষ্ট এর্বাস' (Must Erebus.)

* আর এক কারণে D'urvilleএর নাম সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে, Venus de milo নামে বিখ্যাত মূর্ত্তির রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে। এটা হ'ল প্রাচীন জগতের ভাস্কর-শিল্পের একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মূর্ত্তিটি হারিয়ে যায় এবং D'urville মেলোস দ্বীপে সেই মূর্ত্তিটি খুঁজে পান।

ক্যাপ্টেন নরেস্ (১৮৭৪) সর্ব্বপ্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ, 'চ্যালেঞ্জার'-এ, দক্ষিণ-মেরু সাগরে পাড়ি দেন।

আদ্রিয়ান্ ডি গেরলাশ (১৮৯৭)—শীতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এই দলেই আমুন্ড্সেন নাবিক হিসাবে ছিলেন।

বোর্সগ্রেভিং (১৮৯৮)—সাদার্ণ ক্রশ পার্টি। ৭৮° ডিগ্রী পর্য্যন্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর বেশী আর কেউ অগ্রসর হতে পারেন নি।

স্কট, স্যাকল্টন্ ও উইলসন্ (১৯০১)—দক্ষিণ মেরুতে প্রথম 'শ্লেজ'-এ করে ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত এগিয়েছিলেন।

স্যাকল্টন (১৯০৯)—দক্ষিণ মেরুর ৭০ মাইল দূর থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

স্যর ডগলাস মসন—সাউথ ম্যাগনেটিক পোল আবিষ্কার করেন।

এবার ফিরে আসা যাক্ আমুন্ডসেনের জীবনে।

যখন 'ম্যাডিরা'তে এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর অন্তরের বাসনার কথা জগতে জানালেন। কিন্তু সেই সময় ক্যাপ্টেন স্কটও বেরিয়েছিলেন, দক্ষিণ-মেরুতে পৌঁছবার জন্য। পাছে স্কট কিছু মনে করেন,

সেই জন্য তিনি স্কটের নামে একটা তার পাঠালেন, কিন্তু ক্যাপ্টেন স্কট সে সংবাদ পান নি। •

আমুন্ড্সেন 'হোয়েলস্' উপসাগরের ধারে 'গ্রেট আইস্ ব্যারিয়ার'-এ উপস্থিত হলেন। সেখানে শীত কাটিয়ে তিনি ১৯১১ সালের ২০শে অক্টোবর যাত্রা স্থুরু করলেন।

যাত্রার লগ্ন ছিল ভাল। পথের দেবতা ছিলেন প্রসন্ন। যে বিপদ ও বাধা ক্যাপ্টেন স্কটকে পেরিয়ে আসতে হয়েছিল, সৌভাগ্যবশতঃ সে ধরণের বিপদ আমুনড্সেনকে ভোগ করতে হয় নি। তবে তিনি যে সান-বাঁধানো পথে হেঁটে গিয়েছিলেন, তা নয়।

আমুন্ড্সেনের দলের বাহন ছিল কুকুর—স্কটের দলের বাহন ছিল, পনি ঘোড়া। বাহান্নটি কুকুর নিয়ে আমুন্ড্সেন যাত্রা করেন। মাত্র ১৮টি দক্ষিণ-মেরুতে গিয়ে পৌঁছেছিল, খাদ্য ফুরিয়ে যাওয়ায় পথে ২৪টিকে মেরে ফেলে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাকি ১৮টির মধ্যে ফিরে এসেছিল মাত্র ১২টি কুকুর। এই সম্পর্কে একটা কথা আছে, "The dogs won the Pole. Tbe ponies lost it for England. •

১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর! এই দিন আমুন্ড্সেন

সদলবলে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে পৌঁছলেন! বহু যুগের বহু মানবের সাধনা সেদিন সার্থক হ'ল। নিজের হাতে আমুন্‌ড্‌সেন সেখানে নরওয়ের পতাকা পুঁতলেন।

এই ঘটনার ৩৪ দিন পরে ১৮ই জানুয়ারী ১৯১০, সমস্ত দুর্দ্দৈবকে অতিক্রম করে ক্যাপ্টেন স্কট তাঁর দল নিয়ে দক্ষিণ-মেরুতে উপস্থিত হলেন। দশ বৎসর ধরে তিনি মেরুতে পদার্পণ করবার জন্য চেষ্টা করে এসেছেন, আজ তাঁর আজীবনের সেই সাধনা সার্থক হ'ল। কিন্তু তিনি দেখলেন, তাঁর আসবার আগে, প্রথম আসার গৌরব কেড়ে নিয়েছেন আর একজন। তখনও রয়েছে আমুন্‌ড্‌-সেনের তাঁবু, তখনও উড়ছে নরওয়ের পতাকা। তাঁবুর ভিতরে, তাঁবুর গায়ে আমুন্‌ডসেনের নিজের হাতে লেখা, "Welcome to 90 degrees!"

জয়-গৌরব নিয়ে দক্ষিণ-মেরু থেকে ফিরে এলেন আমুন্‌ড্‌সেন। কিন্তু মেরুপ্রকৃতি স্কট আর তাঁর সহযাত্রী-দের ছেড়ে দিল না। স্কট এবং তাঁর চারজন সহযাত্রী * প্রকৃতির নিষ্ঠুরতম চক্রান্তের মধ্যে যে ভাবে সংগ্রাম করে মরণে অমর হয়েছেন—বীরত্বের ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া দুর্ল্লভ। কিন্তু সে আর এক কাহিনী!

* Dr. Wilson, Lieut Bowers, Captain Oates, Evans.

দুর্গম পথে
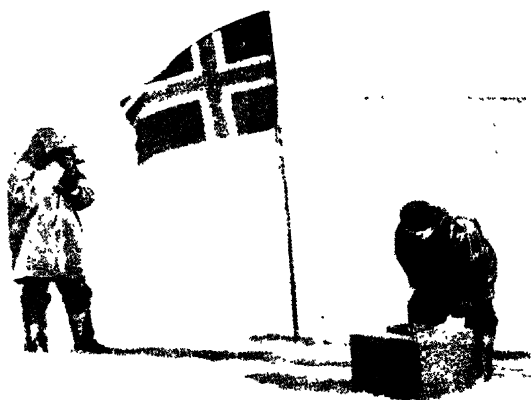
দক্ষিণ মেরুতে মানুষের প্রথম পদার্পণ
১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দক্ষিণ মেরুতে পৌছে
আমুনড্‌সেন সর্ব্বপ্রথমে সেখানে নরওয়ের
পতাকা উত্তোলিত করিয়াছিলেন। ১

—পৃঃ ৭২

মেরু অভিযানে লিন্‌কল্‌ এল্‌সওয়ার্থ ও রোয়াল্‌ড্‌ আমুনডসেন

—পৃঃ ৭০

তারপর এল মহাযুদ্ধ। কামান আর বিষ-বাষ্পের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল মানুষের অন্য সমস্ত সৃজন-প্রয়াস। আমুন্ডসেন যখন দক্ষিণ-মেরু থেকে ফিরে আসেন, তখন জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য নানা পদকে ভূষিত করেন। যুদ্ধের সময় জার্ম্মানীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আমুন্ডসেন সেই সব পদক ফিরিয়ে দিলেন।

মহাযুদ্ধের পর আমুন্ডসেনের বাসনা হ'লো, পায়ে হেঁটে না গিয়ে, এখন সব চেয়ে দরকারী কাজ হচ্ছে, বায়ুপথে গিয়ে মেরু পরিদর্শন করা। তিনি ঠিক করলেন এবার দক্ষিণ-মেরু নয়, উত্তর-মেরু।

অর্থের সন্ধানে তিনি আমেরিকায় এলেন। তখন অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। বক্তৃতা দিয়ে তিনি অর্থ উপার্জ্জন করতে লাগলেন। কিন্তু সেই সামান্য অর্থে মেরু-অভিযান গড়ে তোলা যায় না।

একদিন তাঁর হোটেলে বসে আছেন, এমন সময় ফোন এল!

—হ্যালো! হ্যালো!

—হাঁ, আমি আমুন্ড্সেন!

—আমার নাম লিন্কন্ এলস্ওয়ার্থ! আমেরিকার

ক্রোড়পতিদের উদ্দেশ করে আপনি খবরের কাগজে যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, অবশ্য আপনার প্রস্তাবিত মেরু-অভিযানে সাহায্য সম্পর্কে, আমার বাবা সেই সব প্রবন্ধ পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান! কবে, কোন্ সময়ে আপনার সুবিধা হবে জানলে…. .

লিন্‌কন্ এলস্‌ওয়ার্থের বাবার সঙ্গে আমুন্‌ডসেনের পরিচয় ঘটলো, ক্রমশঃ বন্ধুত্ব হ'ল। একদিন হঠাৎ বুড়ো এলস্‌ওয়ার্থ বললেন, আচ্ছা ক্যাপ্টেন, আমি যদি তোমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য না করি…

কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হয়ে আমুন্‌ড্‌সেন বললেন, তবু জানবেন আমি উত্তর-মেরুতে যাব-ই!

বুড়ো এলস্‌ওয়ার্থ টাকা দিলেন। কিন্তু টাকার চেয়েও ঢের মূল্যবান্ জিনিস আমুন্‌ড্‌সেন বুড়োর কাছ থেকে নিয়ে গেলেন—সে হ'ল বুড়োর ছেলে, ক্রোড়পতির ছেলে লিন্‌কন্ এলসওয়ার্থ। লিন্‌কন্ উত্তর-মেরু অভিযানে আমুন্‌ড্‌সেনের সঙ্গী হলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমুন্‌ড্‌সেন যাত্রার আয়োজন করতে নরওয়েতে ফিরে এলেন। ঠিক হ'ল, 'স্পিট্‌স্‌বার্গেন' (Spitsbergen) থেকে এরোপ্লেনে যাত্রা করা হবে।

১৯২৫ সালের ৯ই এপ্রিল 'ট্রম্‌সো' (Tromso) বন্দর

থেকে জাহাজে করে তাঁরা নরওয়ের তীর ত্যাগ করলেন। মোটর মোটে দুটি 'সিপ্লেন' নেওয়া হয়েছিল। সেই ভাবে তাদের 'স্পিটস্‌বার্গেন' পর্য্যন্ত নিয়ে আসা হ'ল। সেখান থেকে আকাশ-যাত্রার আয়োজন চলতে লাগল।

২১শে মে তাঁরা যাত্রা করলেন, দুটি সি-প্লেনে * ছ' জন লোক। N.24-এ রইলেন লিন্‌কন্‌, (ন্যাভিগেটর) ডিট্রিসেন (পাইলট) এবং ওম্‌ডাল (মেকানিক), N. 25-এ রইলেন আমুন্‌ডসেন (ন্যাভিগেটর), রাসার্‌-লার্সেন (পাইলট) এবং ফ্যুস্‌ (মেকানিক)। তীব্র বেগে দুটি এরোপ্লেন আকাশের দিকে উঠল। বিদায়-দাত্রীদের কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বেজে উঠল, "Welcome back to-morrow!"

যাত্রার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ তাঁরা বিশ্রী কুয়াসার মধ্যে পড়লেন। কুয়াসার হাত এড়াবার জন্যে তাঁদের তিন হাজার ফুট আরও উঁচুতে উঠতে হ'ল। সেখানে উঠে দেখেন, তাঁদের নীচে রয়েছে রামধনু—তারই ফাঁক দিয়ে তখনও দেখা যাচ্ছে সমুদ্র। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সমস্ত কুয়াসা দূর হয়ে গেল, নীচে চেয়ে দেখেন, দূর দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত তুষারের শুভ্র চাদর বিছান রয়েছে—আকাশপথ থেকে উত্তর-মেরুর সেই অপরূপ শুভ্র মহিমা

* N 24 এবং N 25।

সেই প্রথম মানুষের দৃষ্টিগোচর হ'ল। যত দূরে দৃষ্টি যায়, কোথাও সেই শুভ্রতার মধ্যে কোন ছেদ নেই—শুধু মাঝে মাঝে তুষার-বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে—সেগুলি দেখাচ্ছে শাদা কাগজে কালো রেখার মত। যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত মৌনতার মধ্যে তীব্র আর্ত্তনাদ করে ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বেগে ছুটে চলেছে দু'টি এরোপ্লেন।

এই ভাবে আট ঘণ্টা শূন্যপথে তাঁরা এগিয়ে চললেন। ততক্ষণের মধ্যে তাঁদের উত্তর-মেরুতে পৌঁছান উচিত ছিল, কিন্তু উত্তর-পূর্ব্ব বাতাসে তাঁদের গতির মুখ ঘুরে যায়। এধারে এঞ্জিনের ইন্ধনও প্রায় অর্দ্ধেক নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। ঠিক কত দূর পর্য্যন্ত তাঁরা এসেছেন, তা জানবার জন্য তাঁদের নীচে নামতে হবে, কিন্তু সি-প্লেনের নামবার উপযুক্ত জল কোথায়? হঠাৎ সৌভাগ্য-বশতঃ সেই ছেদহীন বরফের মধ্যে তাঁরা একটা ফাঁক দেখতে পেলেন, সেখানে জল রয়েছে।

২১শে মে তাঁরা নামতে সুরু করলেন। উপরে থেকে যা নিরাপদ বলে মনে হয়েছিল, পৃথিবীর কাছাকাছি আসতে দেখা গেল যে, সে জলে নামা অত্যন্ত বিপজ্জনক, জলের মধ্যে ছোট-বড় তুষার-খণ্ড থৈ থৈ করছে। লিন্‌কন্

দক্ষিণ মেরুর ৯০০ মাইল উত্তরে একটা বিরাট ভাসমান বরফের স্তূপের

তারই মধ্যে নামলেন। একটা বড় বরফের চাঁই-এর সঙ্গে তাঁর প্লেন নোঙ্গরে বাঁধলেন, কিন্তু দেখলেন, প্লেন ফুটো হয়ে গিয়েছে। ঠিক সেই সময় বরফের পাশ থেকে একটা 'শীল' মাথা তুলে উঠে আবার ডুবে গেল। প্রাণহীণের রাজ্যে সেই প্রথম প্রাণের অস্তিত্বের পরিচয়!

আমুন্‌ড্‌সেনের প্লেন কোথায়? তিনি কি নামা বিপজ্জনক দেখে সোজা উত্তর মেরুর দিকে চলে গেলেন? অনেকক্ষণ চেষ্টার পর লিন্‌কন্ গ্লাসের সাহায্যে দেখলেন, প্রায় মাইল তিনেক দূরে আমুন্‌ড্‌সেনের প্লেন বরফের মধ্যে থেকে একটু একটু দেখা যাচ্ছে।

আমুন্‌ড্‌সেনও নেমে বিপন্ন হলেন। মেসিন তো ফুটো হয়ে গিয়েছিলই, মোটরও জখম হয়েছিল। সেই অবস্থায় পাঁচ দিন তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বরফের মধ্যে আটকে পড়ে রইলেন। লিন্‌কন্ ও তাঁর সঙ্গীরা আমুন্‌ড্‌সেনের কাছে পৌঁছবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ডিট্রিসেনের চোখ তুষার-আঘাতে অন্ধ হয়ে আসবার মত হ'ল। এধারে প্লেনও ক্রমশঃ জলে ডুবতে আরম্ভ করল। এমন সময় হঠাৎ প্রকৃতির করুণা-বশে সেই নিশ্চল জলে বেগ দেখা দিল। জলের বেগে ভাসতে ভাসতে তাঁরা

ক্রমশঃ আধ , মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন। তখন আমুন্‌ড্‌সেন 'সিগন্যাল' দিয়ে জানালেন, তারা যেন প্লেনের আশা ত্যাগ করে, প্লেন ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। অগত্যা তাদের তাই করতে হ'ল।

লিন্‌কন্‌ এসে দেখলেন, সেই পাঁচ দিনের মধ্যে আমুন্‌সেনের বয়স যেন আরও দশ বছর বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও তার মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই। প্লেনের কেবিনে নতুম করে রুটিন করা হয়েছে, রুটিন মত প্রত্যেক কাজ চল্‌ছে। কোথাও তাড়াহুড়ো, শঙ্কা বা এলোমেলো ভাব কিছু নেই। যদি সেই তুষার-সমাধি বরণ করতে হয়, প্রাচীন 'ভাইকিং'দের মতই বুক ফুলিয়ে তা বরণ করতে হবে!

এধারে একান্ত, উৎকণ্ঠায় জগৎ অপেক্ষা করে ছিল কখন আমুন্‌ড্‌সেন ফিরে আসেন। ফিরে আসবার লগ্ন বহু দিন হ'ল উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে—কৈ আমুন্‌ড্‌সেন তো ফিরলেন না! তবু সকলের বিশ্বাস ছিল, আমুন্‌ড্‌সেন নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন! কোন দুর্য্যোগ তাঁকে আটকে রাখতে পারে না। তিনি ফিরে আসবেনই!

কিন্তু সেই নিষ্করুণ তুষার-কারাগারে ভগ্ন-যান অবস্থায় আমুন্‌ড্‌সেন এবং তাঁর সহযাত্রীরা বুঝেছিলেন,

মৃত্যু সুনিশ্চিত। তাই যদি স্থির, বীরের মত যুঝতে হবে মৃত্যুর সঙ্গে।

সেই অবস্থায় থেকে তাঁরা এরোপ্লেন মেরামত করতে লাগলেন। ক্রমশঃ খাদ্য ফুরিয়ে আসতে লাগল। দিনে আধ পাউণ্ড করে খাদ্য বরাদ্দ হ'ল। এই ভাবে জুন মাস এসে গেল। তাঁরা ঠিক করলেন, এরোপ্লেন ছেড়ে দিয়ে অগত্যা পায়ে হেঁটে গ্রীণল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করবেন। কবে যে বরফ গলে জল হবে, তার কোনও আশা নেই—আর ততদিন কি বেঁচে থাকা যাবে? কোন রকমে ভাঙ্গা এরোপ্লেন মেরামত করা হ'ল, কিন্তু যত রকমে সম্ভব চেষ্টা করেও এরোপ্লেন ছাড়বার সুবিধা আর করে উঠতে পারলেন না।

২রা জুন মধ্যরাত্রিতে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম নেই শুধু আমুন্‌ড্‌সেনের চোখে! প্রাণীহীন সেই অনন্ত মৌনতার মধ্যে তিনি জেগে আছেন·····হঠাৎ এক বিকট শব্দ হ'ল,···তিনি বুঝতে পারলেন দুধার থেকে বরফের চাঁই এসে তাঁদের এরোপ্লেনকে আক্রমণ করেছে······ সকলকে ডেকে তুললেন...সকাল বেলায় দেখা গেল এরোপ্লেন দুধার থেকে ভেঙ্গে গিয়েছে···

আবার তিনি সেই ভাঙ্গা প্লেন জুড়তে লেগে গেলেন।

দু' সপ্তাহ নয়, যেন দু' যুগ! ১৪ই জুন দক্ষিণ দিক থেকে এক দমকা হাওয়া এল। আশা হ'ল মনে, এইবার বোধ হয় প্লেন উঠবে। কিন্তু দক্ষিণ হাওয়া বৃথায় গেল! ১৫ই জুন উত্তর দিক থেকে হাওয়া বইতে লাগল। হাওয়া ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। আশায়, উৎকণ্ঠায়, তাঁরা সকলে প্লেনে যে-যার যন্ত্রের কাছে গিয়ে বসলেন। প্লেন নড়ে উঠল···কুয়াসার মধ্যে দিয়ে উপরে উঠল · আরও উপরে উঠল···ঘরের দিকে দিকে, মাটির দিকে, মানুষের পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলল·· ··ক্রমশঃ নীচে মাটি দেখা দিল······এলস্‌ওয়ার্থ দেখেন তখন সকলে একসঙ্গে পাগলের মত হাতের বিস্কুট চিবোচ্ছে।······আমুনড্‌সেন আবার ফিরে এলেন!

কিন্তু ফিরে এসেই ঠিক করলেন, তিনি আবার যাবেন। উত্তর মেরুতে তো পৌঁছান হয় নি! শূন্য-পথে উত্তর-মেরুর রূপ তিনিই প্রথম দু' চোখ ভরে দেখবেন। তবে এবার স্থির হ'ল, এরোপ্লেনে নয়, উড়ো-জাহাজে। বহু অনুসন্ধানের পর ঠিক হ'ল, যদি ইতালীর উড়ো-জাহাজ (N-1) পাওয়া যায়, তা হলে বড় ভাল হয়। N-1 জাহাজ কেনবার জন্যে আমুনসেন রোমে গিয়ে মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করলেন।

অমরকীর্ত্তি মেরু-অভিযানকারিগণ

( উপরে বামদিক থেকে ) স্যর ডগলস মসন, এ, ডি, গেরলাস, রোয়াল্ড্ আমুনড্সেন, এ্যাডমিরাল ডুরভিল্, ক্যাপ্টেন স্কট, জেমস্ ওয়েডডেল, স্যর ই, স্যাক্ল্টন, এফ, এন, বোলিংসাইডসেন, চার্লস উইলকিস্ ও সি, ই, বোর্সগ্রেভিং।

—পৃঃ ৮১

আমন্ড্সেন
পঁচিশ দিন উত্তর-মেরুর কাছে
বরফে আটক থাকবার পর

'নজে'র মেরু উদ্দেশ্যে যাত্রা

—পৃঃ ৮১

মুসোলিনী বিশেষ চেষ্টা করে তার বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং ঠিক হ'ল, কর্ণেল নোবাইল সেই জাহাজের চালকরূপে আমুন্ডসেনের সঙ্গে উত্তর-মেরুতে যাবেন। এবার যাত্রী সংখ্যা হ'ল ১২*।

কিন্তু যাত্রা-মুখে তিনি শুনলেন, আমেরিকার ক্যাপ্টেন রিচার্ড আকাশ-পথে উত্তরমেরু পরিভ্রমণ করে সগৌরবে ফিরে এসেছেন!

প্রথম যৌবনে একদিন উত্তরমেরু এমনি করে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, এবারেও উত্তরমেরু তাঁর সঙ্গে বাদ সাধল। কিন্তু তবুও তিনি ঠিক করলেন, তিনি যাবেন। ইতালীর N-1-এর নতুন নামকরণ হ'ল 'নর্জ' (Norge), অর্থাৎ নরওয়ে। ১৯২৬ সালের ১১ই মে তাঁরা স্পিট্‌স্‌-বার্গেন থেকে যাত্রা করলেন।

এবার পথে কোনও বিপদ ঘটল না। ষোল ঘণ্টার পর তাঁরা উত্তর-মেরুর ওপারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জাহাজ থেকে তিনটি পতাকা নীচে ফেলে দেওয়া হল। তারপর তাঁরা উত্তর-মেরু অতিক্রম করে এগিয়ে চললেন।

---

* Amundsen Ruser-Larsen, Lincoln Ellsworth Ramm, Gottwaldt, Wisting, Omdall, Johnson, Nobile, Cecioni, Arduino, Caratti.

৭২ ঘণ্টার পর সমগ্র উত্তর-মেরু অতিক্রম করে আবার মানব-জগতে ফিরে এলেন।

উত্তরে উত্তর-মেরু, দক্ষিণে দক্ষিণ-মেরু, দুই মেরুতে উড়ছে তাঁর জয়ের পতাকা! মানুষের অদম্য প্রাণ-শক্তির নিদর্শন!......................

উত্তর-মেরু থেকে ফিরে আসবার পর এক অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। 'নর্জ'-এর চালক মেজর নোবাইলের সঙ্গে আমুন্‌ড্‌সেনের হ'ল তীব্র বাদানুবাদ এবং সেই বাদানুবাদ ক্রমশঃ শত্রুতায় পরিণত হ'ল। ক্রমশঃ আমুন্‌ড্‌সেনের নামও লোক-চক্ষুর অন্তরালে পড়ে গেল। যৌবনের প্রথম দিন থেকে দুর্যোগ আর ঝঞ্ঝার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অকালে নিদারুণ জরা এসে তাঁকে নিঃসঙ্গ স্থবির করে তুলল। একা লোক-চক্ষুর অন্তরালে তিনি শেষ-যাত্রার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু 'ভাইকিং' কি এভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়?

ও-ধারে নোবাইলের হল পদোন্নতি! মেজর নোবাইল হলেন জেনারেল নোবাইল। ১৯২৮ সালের জুন মাসে জেনারেল নোবাইল ইতালীয় উড়ো-জাহাজে আবার উত্তর-মেরুতে যাত্রা করলেন বটে, কিন্তু আর ফিরে এলেন না।

রোয়াল্‌ড্‌ আমুন্‌ড্‌সেন—অদূরে তাঁর জাহাজ "দি ফ্রাম্‌"  —পৃঃ ৮২
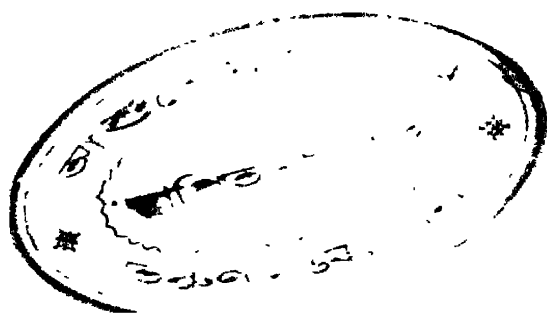
কে যাবে সেই অসীম নির্জ্জনতার মধ্যে, সেই পথ-হীন হিম-মৃত্যুর রাজ্যে পথ-ভ্রান্ত পথিকের সন্ধান আনতে?

জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ আমুন্ড্সেন এগিয়ে এলেন। তিনি যাবেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর খোঁজে সেই মৃত্যুর রাজ্যে! 'ভাইকিং' ছাড়া কে আর তা পারে? 'ভাইকিং' ছাড়া এ দুঃসাহস আর কার সম্ভব?

শেষ-বিদায়ের লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। 'ভাইকিং' কি আর ঘরে বসে থাকতে পারে?

বৃদ্ধ বয়সে আমুন্ড্সেন নোবাইলকে খুঁজতে বেরুলেন উত্তর-মেরুতে। সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনল সেই অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা!

জনাকীর্ণ মানুষের জগৎ ছেড়ে আমুনড্সেন আবার বেরুলেন উত্তর-মেরুর পথে। এবার তিনি আর ফিরে আসতে পারলেন না। উত্তর-মেরুর তুষার-শুভ্রতার মধ্যে কোথায় মিশিয়ে গেল তাঁর দেহ কে জানে!

দক্ষিণ-মেরুতে তাঁর সফল যৌবন-বাসর, উত্তর-মেরুতে তার সমাধি।

এইভাবে য়ুরোপ থেকে চলে গেল তাঁর শেষ 'ভাইকিং'।

# প্রিন্স হেনরী

প্রিন্স হেনরী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পর্ত্তুগালেব একজন রাজকুমার। কিন্তু জগতের ইতিহাসে তাঁর নাম পর্ত্তুগালের যুবরাজ হিসাবে বেঁচে নাই—বেঁচে আছে জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ-আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে। আফ্রিকার সঙ্গে তিনি প্রথম য়ুরোপের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরই চেষ্টা এবং সাধনার ফলে য়ুরোপীয় নাবিকদের দৃষ্টি মহাসাগরের অপর পারের দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই জন্য ইতিহাসে, তাঁর এক নাম 'হেনরী দি ন্যাভিগেটর্',—(Henry the Navigator).

তাঁর পিতার তিনি দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। রাজ্য-শাসন করবার দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি জ্ঞান-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। তাঁর মার নাম ছিল, ফিলিপা।

পর্ত্তুগালের রাজা—রাজা জন ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর-আফ্রিকার উপকূলে কেউটা শহর অধিকার করবার আয়োজন করেন। কিন্তু সমুদ্র বেয়ে সেই অজানা দেশে গিয়ে মূরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কারুর সাহস হ'লনা। অবশেষে প্রিন্স হেনরী সে ভার গ্রহণ করলেন। কথিত আছে যাত্রা করবার সময় প্রিন্স হেনরী শুনলেন যে তাঁর মা মৃত্যুশয্যায়।

মার মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে হেনরী দাঁড়ালেন। ফিলিপা ছেলেবেলা থেকেই ছেলেকে সমুদ্রযাত্রার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন—মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তে তিনি শেষ অনুপ্রেরণা দিয়ে গেলেন।

পুত্রকে পাশে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দিক থেকে এত জোরে হাওয়া এসে প্রাসাদে লাগছে ?

পুত্র উত্তর দিল, উত্তর দিক থেকে!

—এই তোমার অনুকূল বাতাস—বিলম্ব ক'রো না—এখনি যাত্রা কর।

এই কথা কয়টি বলেই ফিলিপা প্রাণ-ত্যাগ করলেন।

প্রিন্স হেনরী মূরদের কাছ থেকে কেউটা দখল করায়, তাঁর নাম সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে প'ড়ল। ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী তাঁকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন যে,

ইংলণ্ডে এসে তিনি ইংলণ্ডের নৌ-সেনার ভার গ্রহণ করুন। কিন্তু হেনরী সে সব প্রত্যাখ্যান করে দক্ষিণ-পর্তুগালের এক নির্জ্জন উপকূলে সমুদ্রের উপর একটা প্রাসাদ, একটা পাঠাগার, একটা বীক্ষণাগার নির্ম্মাণ করালেন। সেখান থেকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দিবারাত্র তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—কেমন করে সমুদ্রের বাধা উল্লঙ্ঘন করে অজানা আফ্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করা যায়। তিনি যে শুধু চুপ করে বসে চিন্তাই করতে লাগলেন তা নয়, দলে দলে নতুন নাবিকও তৈরী করতে লাগলেন—যাদের উৎসাহ আছে সমুদ্রের তরঙ্গকে বশ করবার। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই সময়কার সমস্ত ভৌগলিক এবং সামুদ্রিক তত্ত্বও পড়তে লাগলেন এবং দেশের সমস্ত বড়লোককে একত্র করে পরামর্শ করতে লাগলেন!

কোনও মূরের দেখা পেলেই আফ্রিকার ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে হেণরী তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। মরক্কো, আলজিরিয়া থেকে যে-সমস্ত মূর-বণিকরা য়ুরোপের বাজারে বাটনার মশলা বিক্রি করতে আসত—(সে সময় য়ুরোপ উত্তর-আফ্রিকার উপকূলের বণিকদের কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণে মশলা কিনত নিজেদের খাবার জন্যে। সে-সময়কার রান্না-ঘরের খবর যে সমস্ত ঐতিহাসিক বা

সাহিত্যিক রেখে গেছেন তা থেকে জানা যায় যে সে সময়কার য়ুরোপীয়রা তরকারীতে খুব বেশী পরিমাণে মশলা খেতে ভাল বাসত।) সেই সব মূর-বণিকদের কাছে প্রিন্স হেনরী গল্প শুনতেন—আফ্রিকার ভিতরকার গল্প, গোল্ডকোষ্টের কথা—অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য আছে সেখানকার মাটীর মধ্যে, সেখানকার সীমাহীন জঙ্গলে আছে অফুরন্ত সব মশলার গাছ—কোনও সাদা মানুষের পায়ের দাগ এখনও সেখানে পড়েনি। সেখানকার সেই সব সীমাহীন বনে বনে ঘুরে বেড়ায় দলে দলে অসংখ্য হাতী অসম্ভব রকমের সব জানোয়ার! প্রিন্স হেনরী ধীর ভাবে সব শোনেন এবং মনে মনে স্থির করেন যে, যে রকম করেই হ'ক আফ্রিকার ভিতর ঢুকতেই হবে।

প্রথমে তিনি দুজন লোকের উপর ভার দিয়ে কয়েকখানা নৌকা পাঠালেন। তারা যথাসাধ্য উপকূল ধরে যেতে যেতে হঠাৎ ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একেবারে সমুদ্রে দিশেহারা হয়ে প'ড়ল। জীবনের সকল আশা ত্যাগ করে, ভাগ্যকে ভরসা করে পাড়ি দিতে দিতে হঠাৎ তারা স্থল দেখতে পেল—একটা দ্বীপ—তারা নাম তারা দিল পোর্টো সাণ্টো, (Porto Santo). এই দ্বীপের প্রথম গভর্ণরের মেয়ের সঙ্গেই কলম্বাসের বিবাহ হয়। এই ভাবে তারা 'মাদিরা'

(Madeira) দ্বীপ আবিষ্কার করে। 'কেপ বোজাডোর' পর্য্যন্ত যেতে কেউ সাহস করত না—সকলের তখন একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে আর বেশীদূর গেলেই দৈব-অভিশাপে গায়ের শাদা রঙ কালো হয়ে যাবে। তখন এই সমস্ত কুসংস্কারকে লোকে রীতিমত মানত। কিন্তু প্রিন্স হেনরীর চেষ্টায় 'কেপ বোজাডোর' 'কেপ ব্ল্যাঙকো' পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজরা আবিষ্কার করে। এমন কি 'সিয়েরা লিওন'-এর (Sierra Leone) কাছাকাছি পর্য্যন্ত যায়। এইখান থেকে পর্ত্তুগীজ নাবিকরা একমুঠো সোনার ধূলো আর ত্রিশটি নিগ্রো নিয়ে আসে। নিগ্রোদের দেখে পর্ত্তুগালের লোকেরা তো বিস্ময়ে অবাক। মানুষ যে এত কালো হতে পারে, তা' তাদের ধারণাই ছিল না।

এই সময় থেকে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একটা অতি কলঙ্কময় ঘটনার সূত্রপাত হয়। সেটা হ'ল ক্রীতদাস ব্যবসায়। পর্ত্তুগীজ নাবিকরা স্বার্থান্ধ হয়ে নির্ম্মমভাবে এই অতি ঘৃণ্য ব্যবসা চালাতে থাকে। প্রিন্স হেনরীর সাহায্যে এবং উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তখন দলে দলে নাবিক আফ্রিকার অজানা পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। এবং এই ঘটনার পর থেকেই য়ুরোপীয় নাবিক এবং পর্য্যটকদের দৃষ্টি আফ্রিকার দিকে প'ড়ল।

অবশ্য সে-দৃষ্টির মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার চেয়ে লোভই ছিল বেশী। কিন্তু সে যাই হ'ক, এইভাবে ধীরে ধীরে আফ্রিকার মানচিত্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বাড়তে লাগল।

আগে আফ্রিকাকে বলা হ'তো 'ডার্ক কন্টিনেণ্ট'। অজানা অন্ধকার ঘরে কোন একটা কিছু খুঁজতে হ'লে যেমন কিছুই দেখা যায় না, পাওয়া যায় না, এই মহাদেশ তেমনি অন্ধকারে অজানা হ'য়ে পড়েছিল। ইংরেজ-লেখক সুইফ্‌টের নাম তোমরা হয়ত শুনেছ। তিনি আফ্রিকা সম্বন্ধে একটা কবিতায় লেখেন,—

Geographers, in Afric maps
With savage pictures filled their gaps;
And over unhabitable downs
Placed elephants for want of towns.

অর্থাৎ, আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের এত অল্প ধারণা যে শুধু কতকগুলি অসভ্য লোকের ছবি দিয়ে ম্যাপ ভরাতে হ'ত, হাতী বসিয়ে নগর দেখাতে হ'ত। সেদিনও এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার তৃতীয় সংস্করণে লেখা হয় যে, The Gambia and Senegal rivers are only branches of the Niger—( অর্থাৎ—'গ্যাম্বিয়া' ও 'সেনেগাল' নদী 'নাইগার'-এর শাখা মাত্র ) অথচ আসলে ও তিনটে আলাদা নদী।

প্রিন্স হেন্‌রী এবং তাঁর বীর নাবিকেরা আফ্রিকা সম্বন্ধে য়ুরোপের ধারণা বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তন করে দিয়ে যান। তাঁর নাবিকদের সাধনার ফলে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের একটা সঠিক মানচিত্র তখন গড়ে উঠতে পেরেছিল, যদিও ভিতর-আফ্রিকা তখনও পর্য্যন্ত তেমনি অজানা আশঙ্কায় ভরা ছিল।

আমেরিকা আর য়ুরোপ ভূখণ্ডের মাঝখানে, আতলান্তিক মহাসাগরের বুকে কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলির সংখ্যা হলো মোট নয়টা। বর্ত্তমান ভূগোলে এই দ্বীপপুঞ্জের নাম, য়্যাজোরেড্ (Azored)। এই দ্বীপগুলিকে বলা হয়, আগুণের তৈরী দেশ—কারণ একাদন নিদারুণ ভূমিকম্পে বাড়ব-অনলের সঙ্গে এরা পৃথিবীতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। আয়তনে এই দ্বীপগুলি সর্ব্বশুদ্ধ ৯২০ বর্গ মাইল। আতলান্তিক মহাসাগরের মানচিত্রে অতি ছোট্ট একটা বিন্দুর মত এই দ্বীপগুলি দেখতে পাবে। কিন্তু সমুদ্র-যাত্রার ইতিহাসে এই ছোট্ট দ্বীপগুলি কম দরকারী নয়। আতলান্তিক মহাসাগরের বুকে, দুই বিরাট ভূখণ্ডের মধ্যে এই দ্বীপ-গুলিই হলো সমুদ্র-যাত্রীর বিশ্রাম-স্থল। আমেরিকা যাবার পথে এই দ্বীপপুঞ্জই একমাত্র কলম্বাসকে ক্ষণিক স্থলের

আশ্বাস দিতে পেরেছিল। প্রিন্স হেন্‌রী একদিকে যেমন আফ্রিকার উপকূলে দলে দলে নাবিক পাঠিয়েছিলেন, তেমনি আতলান্‌তিক মহাসাগরে এই দ্বীপপুঞ্জ খুঁজে বার করবার জন্যে আর একদল নাবিক পাঠিয়েছিলেন। এই দলের যিনি নেতা ছিলেন, তাঁর নাম হলো, কেব্রাল (Cabral). তিনি পর্ত্তুগালের হয়ে ১৭৩২ সালে এই দ্বীপ-পুঞ্জ প্রথম আবিষ্কার করেন এবং সেখানে বসবাস করবার জন্যে কয়েকজন মুর কৃতদাসকে রেখে যান। এক বছর পরে যখন ফিরে এলেন, তিনি দেখেন যে, সেই মুর কৃতদাস গুলি ভয়ে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছে। এই দ্বীপের দু'দিকে দুই পাহাড় ছিল। হঠাৎ একদিন অগ্ন্যুৎপাতে তা' নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কেউ আর সে দ্বীপে থাকতে চায় না। তখন কেব্রাল নিজে সেই ভয়ঙ্কর দ্বীপে বসবাস স্থাপন করলেন এবং আজ সেই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় দু'লক্ষ চব্বিশ হাজার লোকের বসবাস। আজও পর্য্যন্ত এই দ্বীপ-পুঞ্জ পর্ত্তুগালের অধীন।
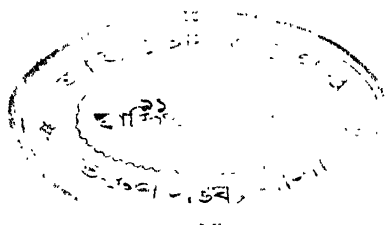
# ষ্টানলী

আফ্রিকার পথের কথা, কিন্তু আরম্ভ করতে হল উত্তর-ওয়েল্‌স্ থেকে। সেখানে ডেনবিঘ্ বলে একটি ছোট্ট সহর আছে—সেই সহরের পরম গর্ব্বের বিষয় যে, সেখানে একদিন স্যার ষ্টানলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন—

স্যার এচ. এম্, ষ্টানলী—যিনি আফ্রিকার অন্তঃস্থলের সঙ্গে সভ্য-জগতের পরিচয় করিয়ে দেন, জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্য্যটক এবং আবিষ্কারক—ষ্ট্যানলী!

পুরানো এক কাস্‌ল্-এর ভগ্নাবশেষের পাশে একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর—সেই ঘরখানিকে জাতীয় সম্পদ্ হিসেবে তারা রক্ষা করে রেখেছে—সেইখানে ষ্টানলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কোন বিদেশী অতিথি এলে, তারা সগর্ব্বে সেই ঘরখানি দেখায়। বলে, ডেন্‌বিঘের পরম সৌভাগ্য,

স্যর হেনরী মর্টন ষ্টানলী

—পৃঃ ৯২
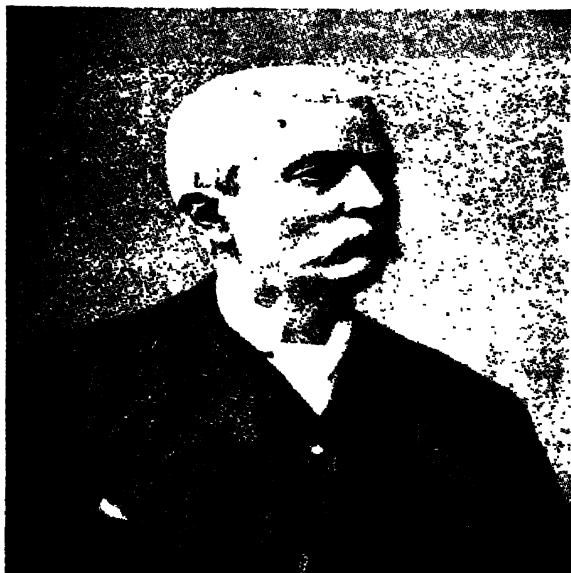
এইখানে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে একদিন স্যার ষ্টানলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেদিন তাঁর নাম ছিল অন্য। ষ্টানলী নাম পরে তিনি নিজে নিয়েছিলেন এবং সেই নামেই তিনি জগতে পরিচিত। তাঁর বাপ-মা নাম রেখেছিলেন 'Rollant'—সেটার ইংরাজী করলে হয় রোল্যাণ্ডস্ (Rowlands)। তাঁর বাবা ছিলেন সামান্য এক চাষীর ছেলে।

ষ্টানলীর ( আমরা এই নামই করব ) যখন মাত্র দু' বছর বয়স, তখন হঠাৎ তাঁর বাবা মারা গেলেন। মিসেস্ প্রাইস্ নামে একজন স্ত্রীলোক সেই শিশুকে লালন-পালন করবার ভার নিলেন। বালকের যখন জ্ঞান হল, তখন সে মিসেস্ প্রাইস্কেই মা বলে জানে।

মিসেস্ প্রাইসের স্বামী বাগানের কাজ করতেন। তাঁর উপর একটা বড় বাগান তত্ত্বাবধান করবার ভার ছিল। তিনি বাগানের কাজ করতেন, আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ষ্টানলী সারাক্ষণ মুক্ত-আকাশের তলায় আলো-বাতাসের মধ্যে প্রজাপতির মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। সেই ভাবে মুক্ত আলো-বাতাসের মধ্যে থাকার দরুণ তাঁকে বেশ সুঠাম এবং বলিষ্ঠ দেখতে হয়েছিল। যে-ই

তাঁকে দেখত; সে-ই আদর করত। সেই সরল কৃষি-জীবনের মধ্যে, রোদে আর বাতাসে ছেলে-বেলা থেকেই তাঁর হাড় পাথর বইবার মত শক্ত হয়ে ওঠে।

যখন তাঁর ছ'বছর বয়স হল—তাঁর পালক-পিতা রিচার্ড প্রাইস্ ঠিক করলেন যে, ষ্টানলীকে স্কুলে দিতে হবে। 'সেণ্ট আসাফ' বলে কিছু দূরে এক নগরে একটা ভাল বোর্ডিং-স্কুল ছিল। ঠিক হল, ষ্টানলীকে সেই বোর্ডিং-এ রাখা হবে। রিচার্ড প্রাইস্ নিজে কাঁধে করে বালককে বোর্ডিং-এ রেখে এলেন। পাছে পথে ছেলের কষ্ট হয় বলে, সঙ্গে একজন চাকরাণীও নিয়েছিলেন। তখন কে জানত, একদিন এই ছেলেকেই চলতে হবে মৃত্যু-রাজ্যের ভিতর দিয়ে, একা, সম্পূর্ণ নিঃসম্বলভাবে।

এই বোর্ডিং-এ ষ্টানলী দশ বছর ছিলেন। দশ বছর পরে যখন তিনি বোর্ডিং থেকে বেরুলেন, তখন তাঁর বয়স ষোল। কিন্তু তখন তিনি অভিভাবকহীন, সংসারে একা। তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর জন্মদাতা পিতা ছ'বছর বয়সের সময়ই তাঁকে ছেড়ে চিরকালের মত চলে গিয়েছিলেন—তার মা পালিকা-জননীর হাতে তাকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তাই বোর্ডিং থেকে বেরিয়ে

যখন দেখলেন যে, সংসারে তিনি সম্পূর্ণ একা, তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হলেন না। ঠিক করলেন, নিজের পথ তিনি নিজেই খুঁজে বার করবেন।

আফ্রিকার মরু-পথের দিশা তখনও ছিল বহুদূরে।

তার এক দূর সম্পর্কের ভাই-এর এক স্কুল ছিল। সেই স্কুলে ছেলে পড়িয়ে তিনি নিজের পড়াশোনা চালাতে লাগলেন। কিন্তু তার ভাইটির মেজাজ ছিল অতি রুক্ষ এবং লোকটা ছিল ভারী হিংসুটে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ষ্টানলীর সঙ্গে লোকটার অ-বনিবনাও সুরু হল—লোকটা ক্রমশঃ ষ্টানলীর সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করতে লাগল। তখন বিরক্ত হয়ে ষ্টানলী সোজা সেই স্কুল ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালেন।

জগতের রাজপথ নানাভাবে, নানাদিকে চলে গিয়েছে—তার মাঝে খুঁজে নিতে হবে-কোন্ পথে আছে জীবনের ঈপ্সিত ধন! কেউ নেই পথের সন্ধান বলে দেবার, পথে আলো দেখিয়ে নিয়ে যাবার! একা খুঁজে নিতে হবে পথ—নিজের হাতে জ্বালিয়ে নিতে হবে নিজের পথ-চলার বাতি।

যুবক তাই ঠিক করলেন। ঠিক করলেন, তিনি খুঁজে নেবেন তার পথ।

গৃহ নেই যে, দু'দিন আশ্রয় নেবেন—বন্ধু নেই যে, দু'দিন আশ্রয় দেবে। আছে শুধু সোজা, এঁকা-বেঁকা নানা পথ। পকেটে আছে মাত্র গুটিকতক পেনী। সেই সম্বল নিয়ে তিনি হাঁটতে সুরু করলেন। সেই সুরু হল জীবনের প্রথম পথ-চলা।

তখন লোকের মুখে মুখে, আকাশে বাতাসে এই কথা ঘুরে বেড়াত যে, আমেরিকার পথে ঘাটে না কি ছড়িয়ে আছে সোনা—কোন রকমে সেখানে একবার যেতে পারলেই হয়। লিভারপুল থেকে না কি অনেক লোক সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় আমেরিকায় গিয়ে, সেখান থেকে থলি ভরে ভরে সোনা নিয়ে এসেছে। অতএব এখন উচিত, সোজা লিভারপুলে যাওয়া।

এই স্থির করে ষ্টানলী হাঁটা-পথ ধরে লিভারপুলের দিকে যাত্রা করলেন—কে জানে কতদূরে লিভারপুল? ষ্টানলী হাঁটতে সুরু করলেন। সেখানে কার কাছে যাবেন? কোথায় থাকবেন? এ দীর্ঘ পথের শেষে কি আছে কে জানে?

তবে এ কথা ঠিক, এ পথ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কেউ সন্ধ্যায় স্নেহ-হস্তে শয্যা পেতে বসে নেই—

এখনও ছেলে ঘরে ফিরে আসে নি বলে কেউ উৎকণ্ঠিত আগ্রহে পথের দিকেও চেয়ে নেই!

লিভারপুলে এসে ষ্টানলী হাড়ে হাড়ে বুঝলেন, বিশাল পাষাণ-পুরীর উদাসীনতা কতখানি। এত বড় সহর এর আগে আর তিনি দেখেন নি—একশটা ডেনবিঘ্‌-এর পেটের ভেতর অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। সান-বাঁধান ফুট-পাথের ধার দিয়ে দীর্ঘ রাস্তা সব দিকে দিকে চলে গিয়েছে—তার ধারে ধারে বিশাল সব বাড়ী—নিঃসহায় পথিকের জন্যে তার একটিরও দরজা খোলা নেই। চারিদিকে মানুষের ভিড় অবিরাম চলেছে আর চলেছে; যে নিঃসম্বল, যে অসহায় তাকে সযত্নে এড়িয়ে চলেছে।

রাস্তার ভিড় ঠেলে ষ্টানলী বন্দরের ধারে এসে পড়লেন। বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে, কোথাও মাল বোঝাই হচ্ছে, কোথাও মাল নামান হচ্ছে। ভিক্ষুকের মত ঘুরে ঘুরে তিনি দেখতে লাগলেন। ঐ সব জাহাজে তার একটুখানি জায়গা হয় না? যে জাহাজ যাবে আমেরিকায়, তাতে কোথাও কি একজন লোকের দাঁড়াবার মত একটু জায়গা হয় না?

কিন্তু ক্ষিদের তাড়ায় আবার সহরের ভিতর ঢুকতে হ'লো। দু'তিন পেনী খরচ করে কিছু খাবার জোগাড়

করলেন। ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হয়ে এল। পথ-ঘাট ক্রমশঃ জনশূন্য হয়ে আসতে লাগল। গৃহহীন পথিক কোথায় যাবে?

একটা গলির ভিতরে ঢুকে একটা পড়ো-বাড়ীর পাশে রাস্তার উপর তিনি শুয়ে পড়লেন। সেইখানেই এক ঘুমে রাত শেষ হয়ে গেল।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আবার তিনি ডকের দিকে চললেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, নিউ অর্লিন্‌স্‌ অভিমুখে এক জাহাজ ছাড়বার উপক্রম করছে। দেখেন, জাহাজের নীচের ডেকে গাদাগাদি করে একদল লোক চলেছে—খোঁজ-খবর নিয়ে জানলেন তারা সব হতাশ হয়ে কাজের সন্ধানে ঘর-বাড়ী ছেড়ে আমেরিকা চলেছে। তাদের সম্বল একটা করে কাপড়ের পুঁটলী লাঠির মাথায় পিঠের কাছে ঝোলান! সেই তাদের সব! ষ্টানলীর তা-ও নেই। তারা ত তবু পয়সা জোগাড় করে টিকিট কেটে জাহাজে চড়েছে! সেই জাহাজে তাদের সঙ্গে যাবার জন্যে ষ্টানলীর মন ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। কিন্তু যাবেন কি করে? টিকিটের পয়সা কোথায়?

তাঁর হঠাৎ মাথায় এক খেয়াল এল। সেই জাহাজের কয়েকজন নাবিক সেইখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ষ্টানলী তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন;—ভাই, ঐ জাহাজে আমাকে একটা কাজ দিতে পার ?

ষ্টানলীর কথার মধ্যে হয়ত তখন এমন একটা আবেদন ফুটে উঠেছিল যে, নাবিকেরা তাঁর কথা শুনে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারলে না। কিন্তু তারা ত আর চাকরী দিতে পারে না। বললে—চল আমাদের ক্যাপ্টেনের কাছে।

ষ্টানলী নাবিকদের সঙ্গে জাহাজে উঠলেন। তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে ক্যাপ্টেনের ভাল লেগে গেল। তিনি বললেন, আমি তোমাকে বিনা পয়সায় আমেরিকা নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তোমাকে কেবিন-ঘরের কাজ করতে হবে।

ষ্টানলী তো হাতে চাঁদ পেলেন। ক্যাপ্টেন যে সত্যি সত্যি তাঁকে জাহাজে করে নিয়ে যাবেন, প্রথমে তাঁর তা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। যেদিন জাহাজ দুলে উঠল, লোকজন তীর থেকে সরে গেল, ক্রমশঃ লিভারপুলের বাড়ীগুলো রেখায় পরিণত হতে চলল, ষ্টানলীর অন্তর আনন্দে দুলে উঠল—তা হলে সত্যই তিনি চললেন আমেরিকায়! পিছনে পড়ে রইল উত্তর-ওয়েল্‌স্‌-এর নগণ্য সহর 'ডেনবিঘ্‌'!

অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চল্‌ল ভাগ্যের তরণী!

( ২ )

নিউ অর্লিন্‌স্‌-এ এসে ষ্টানলী জাহাজ থেকে আমেরিকার মাটীতে নামলেন। সম্পূর্ণ অজানা জগৎ— অজানা সব লোকজন—তার মধ্যে এল সুদূর উত্তর-ওয়েল্‌সের পাড়াগাঁ থেকে এক সহায়-সম্বলহীন ছেলে! এমনি করে যারা ভাগ্যকে খোঁজে, ভাগ্য নিজেই তাদের খুঁজে নেয়।

বেশীদিন তাঁকে পথে পথে বেড়াতে হল না। এক মার্চেন্ট-আফিসে ছোট-খাট একটা কেরাণীর চাকরী জুটে গেল। যাঁর আফিস, তাঁর নাম ছিল ষ্টানলী। ভদ্রলোকের ছেলে-পুলে কেউ ছিল না। ওয়েলসের এই ছেলেটির কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহার দেখে ক্রমশঃ তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। অবশেষে তিনি ঠিক করলেন যে এই অসহায় ছেলেটিকে দত্তক-পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবেন। সেই থেকে তাঁর পুরানো নাম রোলাণ্ডস্‌ বদলে নতুন নাম হলো হেনরী মর্টন ষ্টানলী। অসহায় পথের বালক থেকে সহসা একজন ধনী বণিকের উত্তরাধিকারী!

কিন্তু ভাগ্যের এ ক্ষণিক ছলনা। হঠাৎ বড় ষ্টানলী মারা গেলেন—এমনি হঠাৎ যে তিনি উইলও করে যেতে পারলেন না; তাঁর আত্মীয়-স্বজন সকলে মিলে তাঁর সম্পত্তি দখল করে নিল—ষ্টানলী যেমন পথ থেকে এসেছিলেন, তেমনি তারা আবার তাঁকে পথে বার করে দিল। মাঝখান থেকে শরৎকালের হঠাৎ এক ঝলক বৃষ্টির মতন, ভাগ্যদেবী অসহায় পথের ভিক্ষুককে জীবনের সুখধারায় একটু ভিজিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আবার সেই পথ—আবার সেই ক্ষুধার্ত্ত দিনের শেষে শয্যাহীন রাত্রির বিভীষিকা! কিন্তু ষ্টানলী তাতে বিন্দুমাত্র দমলেন না। তার মনে ছিল এক প্রবল আত্মবিশ্বাস। অন্ধকার যত ঘন হ'ক না কেন, আলোর আশা যারা কিছুতেই ছাড়ে না, ভবিষ্যতে তারাই হয় জয়ী।—ষ্টানলী ছিলেন তাদেরই একজন। তিনি জানতেন, যতক্ষণ পা চলে, ততক্ষণ পথও আছে। যারা চলে না, পথ তাদের পায়ের কাছেই শেষ হয়ে যায়; যারা চলতে পারে তারা পথ তৈরী করে চলে।

সেই সময় আমেরিকায় ভয়ানক গৃহ-যুদ্ধ চলছিল। উত্তর অঞ্চলের যত রাজ্য, তারা হয়েছিল একদল—আর দক্ষিণ অঞ্চলের যত রাজ্য, তারা হয়েছিল আর এক

দল। ক্রীতদাস-প্রথা নিয়ে আমেরিকার এই বিরাট গৃহ-যুদ্ধ বাধে। উত্তরের দল বলে, ক্রীতদাস-প্রথা তুলে দিতে হবে, দক্ষিণের দল বলে তাদের ঘরের ব্যাপারে বাইরের কারুর হস্তক্ষেপ তারা স্বীকার করবে না, ক্রীতদাস প্রথা তারা রাখবেই। এই নিয়ে বাধল তুমুল যুদ্ধ।

সুবিধা পেয়ে ষ্টানলী দক্ষিণ দলে সৈনিক হিসেবে যোগদান করলেন। সেই সময়কার অনেকের মত ক্রীতদাসদের দেখতে দেখতে, জীবনের অন্য নানা আবর্জ্জনার মত তারাও যে একটা অঙ্গবিশেষ, তা ষ্টানলী স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া ষ্টানলীর তখন সব চেয়ে দরকার ছিল একটা কাজের. একটা কিছু করার প্রথম সুবিধা যেখান থেকে এল, সেইটেই তিনি গ্রহণ করলেন। হয়ত তখন তাঁর কাছে জীবনের একমাত্র অর্থ ছিল বৈচিত্র্য. অথবা ইংরাজীতে বললে যাকে বলা যেতে পারে, এ্যাডভেঞ্চার।

জেনারেল জনষ্টোনের সৈন্যমণ্ডলীতে তিনি যোগদান করলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁকে বেশী দিন থাকতে হল না। পিট্সবার্গের যুদ্ধে জেনারেল জনষ্টোন হেরে গেলেন এবং তাঁর দলের অন্যান্য সৈন্যদের সঙ্গে ষ্টানলীও বন্দী হলেন।

সার বেঁধে বন্দীদের পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা নদীর বাঁকের মুখে, সুবিধা বুঝে, ষ্টানলী দল ভেঙ্গে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন! দেখতে দেখতে রক্ষীদের হাতের বন্দুক গর্জ্জন করে উঠল। জলের ওপর চাবুকের মত গুলি গিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু একটি গুলিও সেই দুর্দ্দান্ত, দুঃসাহসী লোকটির গায়ে বিঁধলো না। ডুব-সাতার কেটে কেটে ষ্টানলী একেবারে নদীর ওপারে গিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে, পথে পথে কাজ করে, তিনি সমুদ্রের তীরে এসে পৌছুলেন।

সেখান থেকে আবার এক জাহাজে একটা কাজের যোগাড় করে নিয়ে তিনি ওয়েল্‌স্‌-এ ফিরে এলেন।

বাড়ী ফিরে এসে কয়েকদিন বেশ শান্তভাবেই কেটে গেল। লিভারপুলে একটা কেরাণীর চাকরীও জুটলো। কিন্তু যাযাবর হয়ে যে জন্মেছে, কেরাণীর একঘেয়ে চাকরীতে কি তার মন বসে?

কিছুদিন কেরাণীর কাজ করতে করতেই ষ্টানলীর মন হাঁফিয়ে উঠল।

সুদূর, বিপুল সুদূর, ব্যাকুল বাঁশী বাজিয়ে ঘর-ছাড়া যাযাবরদের ডাকে—বলে, ঘরের প্রদীপ তোদের জন্যে নয়, বজ্রে যে আলো জ্বলে, সেই তোদের আলো!

নিশির ডাকে যেমন করে মানুষ ঘুম ছেড়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি তারা বেরিয়ে পড়ে অজানা অন্ধকারে অনিশ্চিতের আহ্বানে !

কেরাণীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে ষ্টানলী আবার নিউ ইয়র্কে চলে এলেন। সেবার সুবিধা হয়েছিল, দক্ষিণ-দলের সৈন্যমণ্ডলীতে যোগদান করবার, এবার সুবিধা হল উত্তর-দলে !

তিনি উত্তর-দলের নৌ-বাহিনীতে যোগদান করলেন। এক মাসের মধ্যেই ফ্ল্যাগ-শিপ * টিকণ্ডারোগাতে চলে এলেন এবং দেখতে দেখতে এ্যাড্‌মিরালের সেক্রেটারী পদে উন্নীত হলেন।

তাঁর কর্ম্ম-তৎপরতা এবং দুঃসাহসিকতায় সকলে অবাক্ হয়ে যেত। একবার যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ একটা জাহাজ ফেলে যায়। কিন্তু তখনও যুদ্ধ চলছিল। মাঝখানের নদীতে তখন বুলেটের বুদ্বুদ উঠেছে। তারই মধ্যে ষ্টানলী দড়ি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, পরিত্যক্ত জাহাজটার গায়ে সেই দড়ি বেঁধে দিয়ে আসতে।

* এগুলো হলো প্রধান যুদ্ধ-জাহাজ, কারণ এইগুলিতে দলের পতাকা থাকে।

কাজ সেরে ফিরেও এলেন তিনি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ষ্টানলী নৌ-বিভাগের একজন অফিসার হয়েছিলেন।

কিন্তু তারপর? পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, যাদের কাছে শান্ত, নিরুদ্বেগ, সুখের জীবন অসহ্য মনে হয়। তারা চায় অনবরত চলতে, সে-ই তাদের সুখ, সে-ই তাদের শান্তি!

ষ্টানলী নৌ-বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে আমেরিকার বিখ্যাত খবরের কাগজ 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড'-এ যোগদান করলেন। প্রুফ দেখবার জন্যে নয়, চেয়ারে বসে বসে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখবার জন্যে নয়, তিনি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডে যোগদান করলেন, তাদের সামরিক সংবাদ-দাতা হিসেবে! যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে সংবাদ পাঠাতে হবে! এর চেয়ে রোমাঞ্চকর জীবন আর কি হতে পারে?

তখন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলছিল। নেপিয়ারের অধীনে বৃটিশ-বাহিনীর সঙ্গে তিনি আবিসিনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। মাগডালা-বিজয়ের কাহিনী লণ্ডনের কাগজে যখন বেরুল, তার পূরো একদিন আগে সেই খবর নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডে বেরোয়।

এইভাবে ষ্টানলীর বয়স হয়ে এল ত্রিশ। কিন্তু তখনও পর্যান্ত তাঁর জীবনের কোনও গতি নির্দ্দিষ্ট হয় নি।

চোখের সামনে কোনও স্পষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শ ছিল না। শুধু চলার বেগে তখনও তিনি চলেছেন। কিন্তু নদী যেমন চায় সমুদ্রকে, তেমনি জীবন-ধারা চায় কোন স্থির লক্ষ্যকে। নইলে লক্ষ্যহীন হয়ে কত স্রোতের ধারা মরু-পথে হারিয়ে যায়!

ত্রিশ বছরের অশান্ত জীবনযাপন করার পর, এক পথ থেকে আর এক পথে ঘূর্ণীর মতন ঘুরে বেড়ানোর পর, ষ্টানলী একদা তাঁর পথের সন্ধান পেলেন—তাঁর আদর্শের, আদর্শ পুরুষের সন্ধান পেলেন—কিন্তু তাও সহজে পেলেন না, পথ-রেখা-হীন, মানচিত্র-হীন অনির্দ্দিষ্টতার মধ্যে সেই আদর্শ লুকিয়ে ছিল—তাঁর চেয়ে মহত্তর এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করে।

সেই ব্যক্তির নাম ডাঃ লিভিংষ্টোন।

ডাঃ লিভিংষ্টোনের নাম আজ আফ্রিকার নামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। আফ্রিকার বুনো জঙ্গলের মধ্যে তিনি যে পথ করে দিয়েছিলেন, সেই পথ বেয়ে আজ এই মহাদেশের সঙ্গে বাইরের জগতের পরিচয় গড়ে উঠেছে। শুধু দেশ-আবিষ্কারক বলে নয়, তাঁর

মহৎ চরিত্রের গুণে, তিনি আজ জগতের স্মরণীয় হয়ে আছেন। একদিন যে নৃশংস ক্রীতদাস-ব্যবসায় আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের বন্য-পশুর সামিল করে তুলেছিল, তিনি জীবন তুচ্ছ করে সভ্যতার সেই মহাকলঙ্কের বিরুদ্ধে জগতের চেতনাকে জাগ্রত করে তোলেন। সভ্য জগৎ ছেড়ে, সভ্যজগতের সমস্ত সুখ-সুবিধা, ঐশ্বর্য্য ও সম্মান ছেড়ে, মৃত্যু-সঙ্কুল বান্ধবহীন আফ্রিকার বন্য পথে পথে তিনি তাঁর সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেন। শেষবার যখন তিনি আফ্রিকার অন্তরে প্রবেশ করেন, তার পর থেকে তাঁর আর কোন খবর সভ্যজগৎ পায় নি। দাস-ব্যবসায়ীরা প্রচার করতে লাগলো যে ডাঃ লিভিংষ্টোন মারা গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ য়ুরোপের এবং আমেরিকার সমস্ত কাগজে প্রকাশিত হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় কি ভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটলো, তার সঠিক কোন খবরই জগৎ পেলো না।

এইভাবে দু'বছর কেটে গেল। লিভিংষ্টোনের কোন খবর এই দু'বছরের মধ্যে আর পাওয়া গেল না। জগৎ ধরে নিল যে আফ্রিকার অরণ্য লিভিংষ্টোনকে গ্রাস করে নিয়েছে। কিন্তু দু'একজন লোকের মনে তখনও বিশ্বাস ছিল যে ডাঃ লিভিংষ্টোন জীবিত আছেন। কিন্তু সেই

পথ-না-জানা মহাদেশের মধ্য থেকে কি করে তার খবর পাওয়া যায় ?

এই সময় আমেরিকার নিউইয়র্ক হেরাল্ডের স্বত্বাধিকারী জেমস্ গর্ডন বেনেট ঘোষণা করলেন যে, যে-লোক জীবিত বা মৃত ডাঃ লিভিংষ্টোনের সঠিক খবর নিয়ে আসতে পারবেন, তাঁকে সেই অনুসন্ধানের জন্যে যা খরচ লাগে, তাই দেওয়া হবে এবং বিপুল পুরস্কার দেওয়া হবে।

ষ্টানলীর ঘর-ছাড়া মন ঠিক এমনি দুঃসাহসিক কাজের অপেক্ষা করছিল। তিনি বল্লেন, তিনি যাবেন, আফ্রিকার অরণ্য-গভীরতার মধ্য থেকে তিনি নিয়ে আসবেন, জীবিত বা মৃত ডাঃ লিভিংষ্টোনের সংবাদ।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি জান্জিবারে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি লোক সংগ্রহ করতে লাগলেন। তিনি খবর পেলেন যে ক্যাপ্টেন স্পিকের সঙ্গে যে সব কাফ্রী নাইল-নদীর উৎস-সন্ধানে বেরিয়েছিল, তাদের মধ্যে জন ছয়েক তখনও জীবিত আছে। তিনি তাদের সংগ্রহ করলেন। সেই দলের যে মোড়ল তার নাম ছিল বোম্বে। বোম্বে আরও আঠারো জন লোক সংগ্রহ করলো।

ষ্টানলী জানতেন যে মধ্য-আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা টাকা-পয়সার মূল্য জানে না—তাদের জন্যে তিনি নানা রকমের বিচিত্র জিনিস সংগ্রহ করে নিলেন, রঙীন কাপড়, নানা রঙের পাথর, পুঁতি, তার, কাঁচি, ইত্যাদি। এই সব সংগ্রহ করে তিনি বাগামোয়াতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি আরও ১৬০ জন লোক সংগ্রহ করলেন।

এই বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি আফ্রিকার অন্তঃস্থলের দিকে যাত্রা করলেন। যতই অগ্রসর হতে লাগলেন, ততই পথ রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগলো। কিনজানী পেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতে, কোথা থেকে হাজার রকমের মাছি এসে তাঁদের বিব্রত করে তুললো। লাখে লাখে তারা একসঙ্গে এক জায়গায় উড়ে এসে বসে। রাত্রিতে তাঁবুর ভেতরে মানুষেরা কোন রকমে মুড়িশুড়ি দিয়ে মাছির এই উৎপাত থেকে বাঁচতো বটে কিন্তু সঙ্গে যে সব ঘোড়া ছিল, সেগুলোর চরম দুর্দশা হলো। একদিন সকালবেলা দেখা গেল যে একটা ঘোড়াকে মাছিরা এমন কামড়েছে যে, ঘোড়াটার গা ফেটে রক্ত-নদী বয়ে গিয়েছে—ঘোড়াটা সেইখানেই মরে পড়ে আছে। তাঁবুর বাইরে এক জায়গায় মাটী খুঁড়ে তিনি ঘোড়াটার

কবর দিলেন,। এমন সময় দেখেন কতকগুলি লোক এসে উপস্থিত—তাদের রাজা তাদের কর আদায় করতে পাঠিয়েছে। অপরাধ? অপরাধ হলো, তাদের রাজার অনুমতি না নিয়ে কেন তাদের মাটীতে মড়া ঘোড়া পোঁতা হয়েছে। ষ্টানলী বুঝলেন যে, এটা কাপড় আর পাথর আদায় করবার ফিকির। তিনি বল্লেন, বেশ, তিনি কবর খুঁড়ে তাঁর ঘোড়া বার করে নিচ্ছেন! সে ফিকির যখন টিকলো না, তখন তারা ষ্টানলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো।

সেই রাজ্য ছেড়ে তাঁরা জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লেন। দশ মাইল ব্যাপী সেই জংলী পথ—যেন দশ মাইল ব্যাপী একটা 'টানেল'। দুধারে ঝোপ এসে এমনভাবে তাকে ছেয়ে রেখেছে যে, তার মধ্যে দিনের বেলাতেও সূর্য্যের আলো ঢুকতে পায় না। এইভাবে তাঁরা সিম্বাম্উইনী বলে এক জায়গায় এলেন। সেখানে সৌভাগ্যক্রমে ষ্টানলীর সঙ্গে এক আরব ব্যবসায়ীর দেখা হলো। সেই লোকটীর মুখে তিনি প্রথম লিভিংষ্টোনের খবর পেলেন। সেই আরব ব্যবসায়ীটি জানালো যে বছর দু'য়েক আগে, উজিজী গ্রামে ডাঃ লিভিংষ্টোনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তার পর আর তিনি কোন খবর জানেন না। অন্ধকারের মধ্যে ষ্টানলী একটা আলোর দিশা পেলেন।

তিনি দলবল সহ উজিজীর পথে যাত্রা করলেন; এই আশায় যে সেখানে গেলে নিশ্চয়ই কারুর না কারুর কাছে লিভিংষ্টোনের খবর পাওয়া যাবে। বাগামোয়া ত্যাগ করার পর ১৮৫ দিন পায়ে হেঁটে তিনি উনিয়ানিম্বিতে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে তিনি উজিজী যাবার আয়োজন করতে লাগলেন। বাগামোয়া থেকে উনিয়া-নিম্বিতে আসতে এই যে ১৮৫ দিন লেগেছিল, এই ১৮৫ দিনের মধ্যে তাঁকে যে কত বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। দলের লোকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—নিষ্ঠুর হাতে সেই সব বিদ্রোহ তাঁকে দমন করতে হয়েছে। সঙ্গের মানুষের বাধা ছাড়া আফ্রিকার বুনো পথে বাধা আছে পদে পদে। একবার এক নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে নেমে দেখেন, জলে এক মস্ত বড় কুমীর হাঁ করে আছে। নিতান্ত বরাত জোরে তিনি সে যাত্রা প্রাণে বেঁচেছিলেন।

২৯শে জুলাই তিনি উজিজী অভিমুখে যাত্রা করলেন। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে তিনি উজিজীর কাছে এসে পৌঁছলেন। সেখানে শুনলেন যে ডাঃ লিভিংষ্টোন জীবিত আছেন এবং উজিজীতেই আছেন।

ষ্টানলী কালবিলম্ব আর না করে উজিজীতে প্রবেশ

করলেন। সেদিন হাটবার। হাটের মধ্যে আসতেই হঠাৎ ষ্টানলী শুনলেন পেছন দিক থেকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে কারা যেন বল্লে, "Good morning, Sir—"

ফিরে দেখেন, দু'জন কাফ্রী। পরিচয় নিয়ে জানলেন যে তাদের নাম শুমি আর চুমা, ডাঃ লিভিংষ্টোনের ভৃত্য তারা। তারা দু'জনে ষ্টানলীকে নিয়ে যেখানে ডাঃ লিভিংষ্টোন ছিলেন, সেখানে নিয়ে গেল। কিছু দূর অগ্রসর হতে না হতেই ষ্টানলী দেখেন যে তাঁর সামনে শ্বেতকায় এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। মাথার টুপী খুলে ষ্টানলী শুধু বল্লেন, Dr. Livingstone, I presume !

শ্বেতকায় মূর্ত্তিটী উত্তর দিল শুধু, yes !

এতদিন পরে ষ্টানলীর সকল শ্রম সার্থক হলো। তিনি লিভিংষ্টোনকে অনুরোধ করলেন, তাঁর সঙ্গে য়ুরোপে ফিরে আসতে। কিন্তু লিভিংষ্টোন সম্মত হলেন না। তিনি বল্লেন আমি যখন শেষবার ইংলণ্ড ত্যাগ করি, আমি প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলাম যে নাইল্ নদীর উৎস খুঁজে বার করবো। যতদিন না আমি নাইল্ নদীর উৎস খুঁজে বার করতে পারি, ততদিন আর আমি য়ুরোপে ফিরবো না।

ষ্টানলীর বিশেষ অনুরোধে লিভিংষ্টোন তাঁর সঙ্গে

আফ্রিকায় ষ্টানলী ও লিভিংষ্টোনের সাক্ষাৎ

—পৃঃ ১১২

উনিয়ানিম্বি পর্য্যন্ত এলেন। সেখান থেকে তাঁদের তুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ষ্টানলী ফিরে এলেন স্বজন-বন্ধুর মধ্যে, বৃদ্ধ লিভিংষ্টোন আবার ফিরে গেলেন স্বজন-বন্ধুহীন আফ্রিকার অরণ্য-পথে! কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

১৮৭২ সালের ৬ই মে ষ্টানলী আবার অফ্রিকার সাগরকূলে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখান থেকে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। ইংলণ্ডে এসে যখন তিনি প্রচার করলেন যে তিনি জীবিত লিভিংষ্টোনের সংবাদ নিয়ে এসেছেন, তখন একদল লোক তাঁকে মিথ্যাবাদী বিবেচনা করে তাঁর কথা বিশ্বাসই করতে চাইলো না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তিনি যে প্রমাণ সব নিয়ে এসেছিলেন, তাতে অল্প দিনের মধ্যে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। স্বয়ং রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে ডেকে সম্মানিত করলেন এবং রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী তাঁর এই অসমসাহসিক ভ্রমণের জন্যে তাঁকে পদকে ভূষিত করলেন।

১৮৭৪ সালে ষ্টানলী আবার আফ্রিকায় এলেন। অন্তরে বাসনা, লিভিংষ্টোনের অসমাপ্ত কাজ তিনি সম্পূর্ণ করবেন—নাইল নদের উৎস তিনি খুঁজে বার করবেন। এই যাত্রায় যদিও তিনি নাইল নদের উৎস খুঁজে পান নি, কিন্তু তাঁর এই পরিভ্রমণের ফলে মধ্য আফ্রিকার

দুর্গমতা তিনি দূর করেছিলেন। যে দিন তিনি জানজিবার ত্যাগ করে আফ্রিকার ভেতরে ঢোকেন, তার ৯৯৯ দিন পরে আবার জানজিবারে ফিরে আসেন। এই ৯৯৮ দিন পায়ে হেঁটে মধ্য-আফ্রিকার মৃত্যু-সঙ্কুলতার মধ্যে তিনি যে পথ খুঁজে বার করেছিলেন, তার ফলেই আফ্রিকার মানচিত্রের রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছিল। এই যাত্রাতে তিনি ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের চারিদিক প্রায় হাজার মাইল পরিভ্রমণ করেন এবং নাইল নদের এক শাখা ধরে চলতে চলতে দেখলেন যে সোজা সমুদ্র পথে আসা যায়! নাইল নদের এই শাখাটী প্রথম আবিষ্কার করেন লিভিংষ্টোন। সেইজন্যে এর নাম হয় লিভিংষ্টোন নদী। সমুদ্র থেকে সোজা মধ্য-আফ্রিকার অন্তঃস্থলে পৌঁছবার পথ খুঁজে বার করে তিনি আবার ইংলণ্ডে ফিরলেন আবিষ্কারের ফলে সভ্য জগতে একটা আলোড়ন পড়ে গেল। এই নতুন পথে প্রথম অগ্রসর হলো বেলজিয়ম। বেলজিয়মের রাজা তখন লিওপল্ড্। বিভিন্ন জাতির লোক নিয়ে তিনি একটি বিরাট সঙ্ঘ তৈরি করলেন, তার নাম হলো, International Association of the Congo. এই সঙ্ঘের দুটী উদ্দেশ্য ছিল, একটি হলো বাণিজ্য, আর একটি হলো ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধন।

এই সঙ্ঘের তরফ থেকে ষ্টানলীকে আবার আফ্রিকায় পাঠান হলো। ১৮৭৯ সালে তিনি আবার আফ্রিকার উপকূলে উপস্থিত হলেন। এই যাত্রায় তিনি এক অঘটন ঘটালেন। মধ্য-আফ্রিকার বিভিন্ন জাতির চারশো দল-পতির সঙ্গে তিনি বাণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে সোজা বেলজিয়মে ফিরে এলেন। এবং তাঁরই চেষ্টার ফলে য়ুরোপের বিভিন্ন জাতিদের সঙ্গে সর্ত্তে কঙ্গো ফ্রি ষ্টেটের প্রতিষ্ঠা হলো।

পথশ্রান্ত পথিক এতদিন পরে স্থির করলেন যে এবার তিনি বিশ্রাম করবেন। কিন্তু বিশ্রাম তাঁর ভাগ্যে ঘটলো না। ভাগ্যক্রমে সেই সময় আফ্রিকায় আর এক গণ্ডগোল দেখা দিল। ইংরাজ সেনাপতি গর্ডন 'সুদান' প্রদেশে যে শাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে এক মহাবিপ্লব জেগে উঠলো। সেনাপতি গর্ডনের একজন সহকারী সেই বিপ্লব দমন করতে নিযুক্ত হন, তাঁর নাম ছিল ডাঃ স্নিজ্‌ট্‌লার্। কিন্তু তিনি তাঁর নাম পরিবর্ত্তন করে, এমিন পাশা—এই নাম গ্রহণ করেন। য়ুরোপে সেই সময় প্রচারিত হলো যে এমিন পাশা বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়েছেন। মাসের পর মাস তাঁর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। বহুদিনের পর ক্রমশঃ প্রকাশিত হলো যে

তিনি নিহত হন নি, এখনও জীবিত আছেন—তবে একান্ত বিপন্ন অবস্থায় আছেন। অচিরকালের মধ্যে তাঁকে না উদ্ধার করলে, বিপ্লবীদের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। এমিন পাশাকে সেই বিপন্ন অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ধার করবার জন্য একটী দল গঠিত হলো। কিন্তু সেই দলের নায়ক হবে কে? সমস্ত বিশ্রাম-সুখের আশা ত্যাগ করে, ষ্টানলী আবার এগিয়ে এলেন। এমিন পাশাকে উদ্ধার করবার জন্য আবার তিনি আফ্রিকা যাত্রা করলেন। বারশো যাট জন লোকের এক বাহিনী গঠন করে তিনি চললেন। যখন তিনি আমিরি জল-প্রপাতের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁর দল থেকে ৪৪ জন লোক কমে গিয়েছে। এই ৪৪ জনের মধ্যে কেউ কেউ পথের কষ্ট সহ্য না করতে পেরে পথেই প্রাণত্যাগ করে। কেউ কেউ কষ্ট সহ্য না করতে পেরে, গোপনে দল ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু পালিয়ে গিয়েও তারা নিস্তার পায় নি। নর-খাদকদের হাতে পড়ে তাদেরও প্রাণ দিতে হয়েছিল।

আমিরি জল-প্রপাত ছাড়িয়ে এখন যে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, ষ্টানলী জানতেন যে সেই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে একটুও খাদ্য কোথাও পাওয়া যাবে

না—অথচ সেই প্রান্তর পার হতে দশ দিন লাগবে। প্রচুর কলা কেটে শুকিয়ে তিনি সঙ্গে নিলেন। সেই খাদ্যের ওপর ভরসা করে, তাঁরা সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করলেন। পথে নেমে এলো বর্ষা, পথ-চলা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এক দিনের পথ-চলার মধ্যে তাঁদের একবার বত্রিশটী পার্ব্বত্য নদী পার হতে হয়েছে। বর্ষার আগে এই পার্ব্বত্য নদীগুলোর বুক শুকিয়ে থাকে, কিন্তু যখন বর্ষা নামে, তখন হঠাৎ তার জলে এক তীব্র আবেগের সঞ্চার হয়। জলের টানে পা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই যাত্রার মধ্যে তাঁরা বামনদের দেশে এসে পড়েন। দুজন বামনের সঙ্গে তাঁরা ভাব করে ফেললেন। চার ফিট উচু মানুষ, পা হলো মাত্র ৬½ ইঞ্চি লম্বা। সেখানে দু'দিন থেমে আবার কিছু কলা সংগ্রহ করে শুকিয়ে নিলেন।

এই ভাবে অসম্ভব পথের কষ্ট সহ্য করে তিনি তাঁবু ফেলতে ফেলতে কাভালীতে এসে পৌঁছলেন। সেখানে এসে তিনি খবর পেলেন যে এমিন পাশা এখনও জীবিত আছেন, কিন্তু আর বেশী দিন নয়। ষ্টানলী বিপ্লবীদের দলপতির সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে লাগলেন। তারা ভাবলো যে এমিন পাশাকে ছেড়ে দিয়ে উদারতা দেখিয়ে

## জীবনের সাফল্য

### শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী
ও
### শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

"মণ্টুর মাষ্টারের" মতই তেমনি চমৎকার, তেমনি মজার সব হাসির গল্প। তেমনি প্রকাণ্ড বই, পাতায় পাতায় ছবি। শিবরাম বাবুর সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছেন, গৌরাঙ্গ বাবু, অল্পদিনেই হাসির গল্প লিখে নাম কিনেছেন যিনি। **দাম ছয় আনা**

## সোনার পাহাড়

### শ্রীযোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী। কি কি ভয়াবহ বিপদে দুটি বাঙালী ছেলেকে পড়তে হয়েছিল—শক্তি ও সাহসের দ্বারা কি ভাবে বিপদ কাটিয়ে উঠেছিল, তা পড়লে যেমন গায়ে কাঁটা দেয়, তেমনি উৎসাহে লাফাতে হয়। **দাম দশ আনা**

## গল্পঠাকুরদা

### শ্রীবুদ্ধদেব বসু

তোমাদের কত বন্ধুবান্ধব নাওয়া, খাওয়া, পড়াশুনার মধ্যে কেমন সব মজার মজার গল্প গড়ে তুলে, তা হয় ত তোমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু "গল্পঠাকুরদার" মুখে সেগুলো শুনলে অবাক্‌ হবে। ভাববে—তাই ত! নূতন বই। **দাম ছয় আনা**

# লালন ফকিরের ভিটে

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

নাম করা বই—গল্পগুলির মধ্যে একটা হাল্কা হাসি ও রহস্যের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—তাই বার বার পড়লেও কখনও পুরোণো ঠেকে না।

দ্বিতীয় সংস্করণ। **দাম ছয় আনা**

# পরীর গল্প

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

রূপকথার গল্প। প্রত্যেকটি গল্প মধুময়। তোমাদের মনকে ধীরে ধীরে বাস্তব থেকে কল্পলোকে নিয়ে যাবে—ভুলে যাবে তুমি গল্প পড়ছ। মনে হবে তুমিই যেন গল্পের নায়ক। **দাম ছয় আনা**

# মায়াপুরীর ভূত

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

ভয়ের বদলে হাসির ফল্গুধারা প্রতি ছত্রে ছত্রে।

দ্বিতীয় সংস্করণ। **দাম ছয় আনা**

**"ভাইবোন" বলেন**—শিশু-সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকদের মনোরম রচনা সংগ্রহ। বিরাট অভিধানের মত মোটা, পড়িতে পড়িতে পূজার ছুটি পার হইয়া যাইবে। দশ আনার বই যাঁরা ছ'আনায় দেন তাঁহাদের পাঁচসিকার বইয়ের কত দাম হওয়া উচিত, রুল অফ থ্রি করিয়া আবিষ্কার করিতে হয়। ছবি ও গেট-আপ প্রলোভনময়। নূতন জামা কাপড়ের চেয়ে এ বই পেলে ছেলেমেয়েরা বেশী খুসি হইবে।

**"রংমশাল" বলেন**—এত সস্তায় বই কেমন করে বার করেন ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। শুনেছি তাঁদের উদ্দেশ্য বাংলার ঘরে ঘরে তাঁদের বই পৌঁছুক। **আরতি** তোমাদের পূজার ছুটী কাটাবার মস্ত বই। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধে সবশুদ্ধ ৪৯টী। ছবিও অনেক। বইটির আয়তনের তুলনায় দাম সস্তাই বলতে হবে।

**"মাসপয়লা" বলেন**—এই বৃহৎ পূজা-বার্ষিকী খানা হাতে পাইলে লম্বা ছুটির কয়দিনের জন্য শিশুরা নিশ্চিন্ত হইবে। এতে গল্প, হাসির কবিতা, মজার ছবি প্রভৃতি আছে। শিশুমহলে **আরতি** আদর লাভ করিবে।

**"রামধনু" বলেন**—এই বিপুল কলেবর বার্ষিকীখানা নিয়ে শিশু-রাজ্যে হাজির হয়েছেন। এতে বাংলার বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের লেখা অজস্র গল্প ও নানা বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধ দেওয়া হয়েছে—ছবিও অনেক আছে। এ বই শিশুমনের খোরাক যোগাতে পারবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৫০, দাম মাত্র ১।০।

**"মৌচাক" বলেন**—এই বার্ষিকীখানি সম্পাদন করেছেন শিশুদের প্রিয় লেখক শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু। হাসির কবিতা ও মজার গল্পের এই বইখানি পড়িয়া শিশুরা মুগ্ধ হইবে।

**"পরিকথা" বলেন**—দিব্য অঙ্গ-লাবণ্যে মনোহর বর্ণিকায় শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসুর হাত ধরিয়া "আরতি" বাহির হইল। ইহাকে সাজাইয়াছেন শ্রীযুক্ত সজনী দাস, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। পাঁচসিকা দর্শনী দিয়া কোথায় কিরূপ মানাইল বিচার করুন।
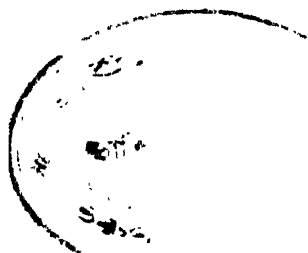
এ ছাড়া নানা সাময়িক পত্রে 'আরতির'
আরও অনেক প্রশংসা বেরিয়েছে;
স্থানাভাব বলে আমরা এখানেই ক্ষান্ত
হ'তে বাধ্য হ'লাম।